তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৭



প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল
ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং ওআর্কস। ৯৪ বিবেকানন্দ রোড। কলিকাতা ৬

পরমশ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক

শ্রীযুক্ত মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য

শ্রীচরণকমলেষু

প্রথম প্রস্তাব

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

সাহিত্য লোকোত্তর আনন্দের সঞ্চার করে। কবির সৃষ্টি প্রজাপতির সৃষ্টির মতোই বিচিত্র ও রহস্যময়। যুগে যুগে সহৃদয় সমালোচক ও পাঠক এই বিচিত্র সৃষ্টির রহস্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তবু মনে হয় এই রহস্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইতেছে না। যে-সমস্ত পথে এই রহস্যের সন্ধান মিলিবে না বরং আমাদের জিজ্ঞাসা বাধা পাইবে প্রথমে তাহাদের কথাই বলা যাক। অনেকে কাব্য বা সাহিত্যের রহস্যের সন্ধান করিতে যাইয়া শুধু প্রতিশব্দ দিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিশব্দ সংজ্ঞা নহে। যেমন, আমরা বলিয়া থাকি, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস কাব্যবস্তুর নামান্তর মাত্র; যতক্ষণ পর্যন্ত রস কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংজ্ঞার কোনো অর্থ হয় না। বিশ্বনাথ রসের সংজ্ঞা দেন নাই এমন কথা বলিতেছি না। শুধু মনে রাখিতে হইবে কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলিলে কাব্যের প্রতিশব্দ দেওয়া হয়, পরিচয় দেওয়া হয় না। কেহ কেহ আবার প্রতিশব্দেরও অপেক্ষা রাখেন না। ইংরেজ কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড বলিয়াছেন যে কাব্য জীবনতত্ত্বের আলোচনা করে অথবা গভীর জীবনবেদ রচনা করে। কিন্তু যে-কোনো জীবনবেদই যে কাব্য হইবে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে কাব্যসৌন্দর্য ও কাব্যসত্যের নিয়মানুসারে তত্ত্বালোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাই কাব্য যাহা কাব্যের নিয়ম মানিয়া চলে।

অপর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁহারা প্রমেয়কে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাব্যবিচারে অগ্রসর হন। তাঁহাদের আলোচনা

যেখানে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল সেইখানেই তাঁহারা আলোচনা সমাপ্ত করেন। জগন্নাথ বলিয়াছেন যে রমণীয় অর্থ-প্রতিপাদক শব্দের নাম কাব্য। কিন্তু রমণীয় অর্থ কাহাকে বলে তাহাই তো বিচার্য বিষয়। কোন্ লক্ষণ থাকিলে অর্থ রমণীয়তা লাভ করে সেই প্রশ্নের সমাধান না করিলে এই সংজ্ঞা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দিতে পারিবে না। জগন্নাথের আলোচনায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ও নানা মতের সন্নিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মূল বিষয়ের আলোচনায় তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, কারণ তিনি প্রমেয় পদার্থকে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জনৈক ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন যে, বস্তুজগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চিত্ত নানাভাবে স্পন্দিত হয় এবং তজ্জন্য অনেক সময় চিত্তবিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কাব্য হইতেছে সেই বস্তু যাহা এই নানাবিধ স্পন্দন-আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু কাহাকে সামঞ্জস্য বলিব তাহা বুঝাইয়া না বলিতে পারিলে এই সংজ্ঞার কোনো সার্থকতা থাকে না। কতটুকু কামনা-বাসনা, কতটুকু সংযম-তিতিক্ষা, কতটুকু অহংকার, কতটুকু বিনয়ের সম্মিলনে সুসমঞ্জস মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে জানিতে হইবে এবং তার পর দেখিতে হইবে এই সামঞ্জস্য কাব্যের অধিগম্য কি না। ম্যাথু আর্নল্ড নিজে কবি ছিলেন, তাই কাব্যনির্ণয়ের তিনি একটি কবি-সুলভ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। হোমার দান্তে শেক্সপীয়র প্রভৃতি বড়ো বড়ো কবিদের কাব্য হইতে শ্রেষ্ঠ পঙক্তিগুলি বাছাই করিতে হইবে এবং এই পঙক্তিগুলিই কাব্যবিচারের অভ্রান্ত মানদণ্ড হইবে। কিন্তু এই আপাতসহজ সমাধান মূল প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গিয়াছে। সেই প্রশ্নটি এই: কেন হোমার দান্তে শেক্সপীয়রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিব এবং কোন্ মানদণ্ড অনুসারে তাঁহাদের রচনা হইতে পঙক্তি আহরণ করিব? সেই প্রশ্নের

সমাধান না হইলে তাঁহাদের রচনার সাহায্যে কাব্যবিচার সম্ভব হইবে না।

প্রশংসাসূচক বিশেষণের দ্বারা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার রীতি সর্বদেশে ও সর্বকালে সুপরিচিত। কোনো-একটি কবিতা বা নাটক ভালো লাগিলে তাহা অতি সুন্দর, অতি চমৎকার, অতি বিস্ময়কর, অতি গভীর, অতি অনির্বচনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া অনেক সমালোচক মনে করেন যে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদিত হইল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ফাঁদে পা দিয়াছেন। কোনো বিশেষ কাব্য বা উপন্যাস নহে, তিনি সাহিত্যের রহস্যকেই অনির্বচনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই বর্ণনা প্রাচীন আলংকারিকদের দ্বারা সমর্থিত এই কথাও বলিয়াছেন। প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে কেহ কেহ কাব্য ও সাহিত্যের রসকে অনির্বচনীয় বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আনন্দবর্ধন এই জাতীয় সমালোচনাকে উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যাঁহারা কাব্যের আত্মাকে অনির্বচনীয় বলেন তাঁহারা অন্ততঃ এই কথা স্বীকার করিবেন যে এই 'অনির্বচনীয়' শব্দের দ্বারা তাহা আখ্যেয়। সাহিত্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কিন্তু এই জাতীয় প্রশংসাসূচক বিশেষণের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ বা বিচার সম্ভব নয়।

প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন যে রচনার উৎকর্ষসূচক গুণের নির্দেশ করিলেই সাহিত্য-তত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে। যেমন কোনো কোনো রচনা সুকুমার, তাহার মধ্যে মাধুর্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো রচনা দীপ্তিগুণসমন্বিত; গুরুগম্ভীর রচনার ওজস্বিতাগুণ সর্বজনবিদিত এবং সমস্ত রচনায়ই প্রসাদগুণ বাঞ্ছনীয়। এই জাতীয় সমালোচনা সাহিত্যের বহিরঙ্গের বর্ণনা দেয়, তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে

না। সুতরাং এই জাতীয় মানদণ্ডের দ্বারা সাহিত্যের মর্মোদ্‌ঘাটন তো সম্ভব নয়ই বরং অনেক সময় ইহাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। প্রসাদগুণ সমস্ত রচনার কাম্য— কাব্যে, চিঠিপত্রে, দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনায়, রাজনীতিবিদের বক্তৃতায়, সংবাদপত্রের প্রবন্ধে। কিন্তু কবির প্রতিভা অনেক সময়ই অভিব্যক্তি লাভ করে হেঁয়ালির মধ্য দিয়া, অতিশয়োক্তিতে এবং নানার্থদ্যোতক শব্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনার সাহায্যে। ডা'ন, হপকিন্স এবং আধুনিক কবিদের কাব্যে প্রসাদগুণ আছে এমন কথা বলা যায় না এবং এই-সকল কবিতায় প্রসাদগুণ থাকিলে কাব্য হিসাবে তাহারা উৎকৃষ্টতা লাভ করিত এমন কথাও কেহ বলিবেন না। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আরো প্রসাদগুণবিশিষ্ট করিলে তাহার ওজস্বিতা নষ্ট হইয়া যাইত। ওজস্বিতারও কোনো ধরাবাঁধা লক্ষণ নাই; কখনো তাহা সমাসবদ্ধ পদের সাহায্যে আত্ম-প্রকাশ করে আবার কখনো সমাসবদ্ধ পদের অপেক্ষা রাখে না। এই-সব কথা ছাড়িয়া দিলেও গুণবাদকে সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। গুণের দ্বারা গুণীর সংজ্ঞা হয় না। জনৈক ইংরেজ দার্শনিক বলিয়াছেন যে স্বর্ণ পীতবর্ণ, কিন্তু পীতবর্ণত্বের দ্বারা স্বর্ণের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যে মাধুর্য ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু ইহারা সাহিত্যের সংজ্ঞা নহে।

২

কাব্য ও সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পরিচিত সংজ্ঞা এই যে, তাহা অলংকৃত বাক্য। অলংকার হইতেই কাব্যকে চেনা যায় এবং এইজন্য এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য বলিয়াও মনে হয়। শব্দ ও অর্থের সংযোগে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সেই শব্দ ও অর্থ যখন অলংকৃত হয় তখনি তাহা সৌন্দর্যশালী হয়। রমণীর দেহ কটক-কেয়ূরাদির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয়।

তেমনই বাক্য উপমা-রূপকাদির সাহায্যে শোভাশালিতা লাভ করে। এই রমণীর মুখ স্থন্দর— ইহা আটপৌরে গদ্যের ভাষা। যদি বলি এই রমণীর মুখ চন্দ্রের মতো, তাহা হইলে এই সাধারণ কথাটি কিঞ্চিৎ অসাধারণত্ব লাভ করিল। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যশাস্ত্র (poetics) ও অলংকারশাস্ত্র (rhetoric)— এইরূপ ছুইটি বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় আমরা প্রাচীন কালেই পাই, কিন্তু আমাদের দেশে সবাই অলংকারবাদ না মানিলেও, সাহিত্যশাস্ত্র অলংকারশাস্ত্র নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে এবং কাব্যের রহস্য ও রূপকাদি অলংকরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এই কথা সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে নানাবিধ অলংকার নির্ধারিত হইয়াছে এবং তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ-উপবিভাগ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে।

সাহিত্য ও কাব্যে অলংকারের অনুপ্রবেশ অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। কারণ মনের কথা সহজভাবে বলিলে কাব্যের অসাধারণত্ব কোথায় থাকিবে ? কিন্তু তবু ইহাও মনে হয় যে অলংকারের সঙ্গে কাব্যের অন্তরের সম্পর্ক নাই ; অনেক সময় অলংকার বহিরঙ্গের শোভা মাত্র। 'কাব্যের অলংকার' পদটি বিশ্লেষণ করিলেই এই যুক্তি স্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত পদই ছুইটি পৃথক বস্তুর সম্পর্ক সূচিত করে। 'আমার বাড়ি' 'আমার ঘর' প্রভৃতি পদ ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে বাড়ি ও ঘরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকিলেও আমি বাড়ি ঘর হইতে পৃথক। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বস্তুকেই সম্বন্ধবোধক প্রত্যয়ের দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হয়। রাহু তাহার শির হইতে অভিন্ন, আমার প্রাণ হইতে আমি অভিন্ন। কিন্তু তবু আমরা বলিয়া থাকি— রাহুর শির, আমার প্রাণ। এখন প্রশ্ন এই : কাব্যের অলংকার কি কাব্যের অবিযুক্ত আত্মা, না, রমণীদেহের অলংকারের ন্যায় ইহাকে ইচ্ছামত গ্রহণ অথবা ত্যাগ করা যায়।

যাঁহারা অলংকারকে কাব্যের আত্মা বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা বলেন কোনো পরিচিত অলংকার নাই এমন কাব্য পাওয়া অসম্ভব নহে। মম্মট ভট্ট এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

'যে নায়ক আমার কৌমার্য হরণ করিয়াছিল সে তেমনি আছে; সেই চৈত্ররজনীও তেমনি আছে, উন্মীলিত মালতীকুসুমের সৌরভাকুল কদম্ববনের প্রগল্‌ভ বায়ু পূর্বের মতোই আছে; আমিও তেমনি আছি। তবু রেবাতীরস্থ বেতসবৃক্ষতলের সুরতলীলার জন্য আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হয়।'

ওথেলো তাহার জীবনের চরম সংকটের মুহূর্তে বলিয়া উঠিয়াছিল: **'Who can control his fate?'**

'কপালকুণ্ডলা'য় মতিবিবি যখন মেহের-উন্নিসার হৃদয়ের কথা যাচাই করিতেছিল, তখন মেহের-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত উক্তি করিয়াছিল, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' এই-সব উক্তির কাব্যসৌন্দর্য কোনো অলংকারের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় না। কেহ কেহ বলিবেন যে এই যুক্তি সত্য নহে, কারণ এই-সব উক্তিকে প্রচলিত অলংকারের মধ্যে ফেলা যায় এবং যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করিয়া আরো অলংকার উদ্ভাবন করিলেই হয়। এইখানেই অলংকারবাদের মৌলিক ত্রুটি ধরা পড়ে। অলংকার একটি বিশেষ লক্ষণের নামকরণ মাত্র; ইহা সেই লক্ষণটির একটা বিবরণ, সংজ্ঞা নহে। এই রমণীর মুখ চন্দ্রের মতো, এই রমণীর মুখচন্দ্র— এই দুইটি

বাক্যের প্রথমটি উপমা, কারণ ইহার মধ্যে মুখ ও চন্দ্রের সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টি রূপক, কারণ তাহার মধ্যে মুখে চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে। কাব্যবাক্যে যাহা কল্পিত হইয়াছে উপমা ও রূপক তাহা বিশ্লেষণ করিল, অথবা তাহার বর্ণনা দিল, কিন্তু এই বর্ণনার দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হইল না, তাহার স্বরূপব্যাখ্যা হইল না। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে কোনোরকম অলংকরণ করা হয় নাই, সেইখানে কোনো অলংকারের কল্পনা কষ্টকল্পনারই পরিচয় দিবে। অনন্যোপায় হইয়া কোনো কোনো আলংকারিক স্বভাবোক্তি-অলংকারের কথা বলিয়াছেন ; যখন পদার্থসকলের প্রকৃত রূপগুণাদির যথাযথ বর্ণনা দেওয়া হয় তখন তাহাকে স্বভাবোক্তি অলংকার বলা যাইতে পারে—

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এখানেও এই যুক্তির সারহীনতাই প্রমাণিত হইবে। স্বভাবের যথাযথ বর্ণনাই যদি অলংকরণ হয় তবে অলংকরণ ব্যাপারের কোনো অর্থই থাকে না, অলংকার অলংকার্য হইতে অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কেহ নিজেই নিজের স্কন্ধে উঠিতে পারে না, তেমন কোনো উক্তি নিজেকে অলংকৃত করিতে পারে না।

৩

কাব্যে অলংকার প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, কিন্তু অলংকৃত বাক্যই কাব্য এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কারণ, প্রথমতঃ, অনলংকৃত বাক্যের মধ্যেও কাব্যের চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অলংকার নামকরণ মাত্র ; তাহা বাহির হইতে কাব্যের বিবরণ দেয়, তাহার অন্তরে

প্রবেশ করিতে পারে না; কোন্ গুণের বলে উপমা রূপক প্রভৃতি সাহিত্যপদবাচ্য হয় তাহা এই বর্ণনায় পাওয়া যায় না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। রমণীর মুখের সঙ্গে চন্দ্রের বা পদ্মের তুলনা করিয়া তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাইতে পারে নানাভাবে: তোমার মুখ চন্দ্রের মতো (উপমা), তোমার মুখচন্দ্র (রূপক), চন্দ্রই তোমার মুখের মতো (প্রতীপ), ইহাই চন্দ্র— তোমার মুখ নহে (অপহ্নুতি), চন্দ্র তোমার মুখের মতো আর মুখ চন্দ্রের মতো (উপমান-উপমেয়), তোমার মুখ নিরুপম— ইহা তোমার মুখই (অনন্বয়), চন্দ্রকে দেখিয়া তোমার মুখের কথা মনে পড়িল (স্মরণ), তোমার মুখ দেখিয়া (চন্দ্রভ্রমে) চকোর পক্ষী তাহার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল (ভ্রান্তিমৎ), ইহাই চন্দ্র ইহাই পদ্ম, এই মনে করিয়া চকোর ও মক্ষিকা ইহার দিকে ধাবিত হইল (উল্লেখ), ইহাই তো চন্দ্র (উৎপ্রেক্ষা), ইহা দ্বিতীয় চন্দ্র (অতিশয়োক্তি), চন্দ্র ও পদ্ম তোমার মুখের কাছে পরাস্ত হইয়াছে (তুল্যযোগিতা), তোমার মুখ ও চন্দ্র রাত্রিতে উদ্ভাসিত হয় (দীপক), তোমার মুখ অনুক্ষণ শোভা পায়— চন্দ্র কিন্তু শুধু রাত্রিতে শোভা পায় (ব্যতিরেক), আকাশে চন্দ্র আর ধরাতলে তোমার মুখ (প্রতিবস্তূপমা), তোমার মুখ চন্দ্রের শোভা ধারণ করে (নিদর্শনা), চন্দ্র তোমার মুখের কাছে মলিন হইয়া গিয়াছে (অপ্রস্তুতপ্রশংসা), তোমার মুখচন্দ্রের দ্বারা হৃদয়সন্তাপ বিদূরিত হয় (পরিণাম), তোমার মুখ কালো চোখের দ্বারা লাঞ্ছিত এবং হাস্য সুধায় শোভিত (সমাসোক্তি)।[১]

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণগুলি আলোচনা করিলে কয়েকটি কথা সহজেই

[১] দ্র. ডক্টর সুশীলকুমার দে'র *Studies in the History of Sanskrit Poetics*, Vol II, pp. 87-8।

অনুমিত হইবে। প্রথমতঃ, একই কথার এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া বহু অলংকার রচনা করিয়া লাভ কি ? এখানে কুড়িটির বেশি অলংকারের নাম করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি অলংকারের আবার নানা প্রকারভেদ করা যাইতে পারে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কি কাব্যের মূল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে ? আমাদের দেশে অলংকারের প্রভেদ লইয়া যে তর্ক-আলোচনা হইয়াছে তাহা সাংস্কৃতিক অধোগতিরই পরিচয় দেয়। অলংকার শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল ভামহ প্রভৃতির রচনায়, আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত অলংকার-বাদের ঊর্ধ্বে অধিরোহণ করিয়া রস ও ধ্বনির ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাঁহাদের পরে ধ্বনিকে মানিলেও সাহিত্যশাস্ত্রের লেখকগণ পুনরায় অলংকার-বিশ্লেষণের মোহে পড়েন এবং ধীরে ধীরে সাহিত্যশাস্ত্র অলংকারশাস্ত্র নামে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য দেশের আলোচনায় নন্দনতত্ত্বকে কখনো অলংকারশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয় নাই। সুতরাং সেইখানেই এই অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শ্রেষ্ঠ অলংকার বহিরাবরণমাত্র নহে, প্রতিভার যে স্ফুরণে কাব্য রূপ পায়, অলংকরণ তাহারই অঙ্গ ; তাহা কটক-কেয়ূরের মতো ইচ্ছামত গ্রহণ বা ইচ্ছামত ত্যাগ করা যায় না এবং অলংকরণের জন্য পৃথক্ প্রযত্নেরও প্রয়োজন হয় না।

বিষয়টি অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। উপরে যে অলংকার-গুলির কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে একই কথা বলা হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রশ্ন এই : সেই বৈশিষ্ট্যটি কি ? সেই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করিতে পারিলেই আমরা সাহিত্যের মূল তত্ত্বে পৌঁছিতে পারিব। ভামহ মনে করিতেন যে সেই বৈশিষ্ট্য অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তি। এই মত গ্রাহ্য নহে। প্রথমতঃ, এই মত মানিলে যে-সমস্ত রচনায়

অতিশয়োক্তি নাই, যাহা স্বভাবোক্তিপূর্ণ তাহার বিচার করিব কি ভাবে? দ্বিতীয়তঃ, যে কোনো অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্যই তো কাব্য নহে। কাব্যে অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে কিন্তু অতিশয়োক্তি কাব্য নহে। আমরা যখন কাব্য পড়ি তখন আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হয় না যে, কবি সাধারণ কথাকে বাড়াইয়া বলিতেছেন। বরং ইহাই মনে হয় যে, কবি জীবনের সত্যকে আমাদের চেয়ে আরো গভীর ও নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তিনিই জীবনের রহস্যের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছেন।

কোনো কোনো ইংরেজ লেখক মনে করেন যে, রূপকই সমস্ত অলংকারের সাধারণ ধর্ম এবং রূপকই কাব্য ও সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। কোনো দুইটি বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কবি কোনো কোনো বিষয়ে এমন-একটা গভীর সাদৃশ্য দেখেন যে, তিনি একটিকে অপরটির মধ্যে আরোপ করিতে পারেন। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, সেই বিরোধকে অতিক্রম করিয়া কবি তাহাদের একাত্মতা প্রমাণ করেন। যে বিরোধ স্পষ্ট, অবশ্যস্বীকার্য তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারেন বলিয়াই কবি চমৎকার উৎপাদন করিতে পারেন। আমাদের প্রায় সমস্ত উক্তিই রূপক-গর্ভ এবং সেইজন্যই সাধারণ ব্যবহারের ভাষার মাধ্যমেই কবি কাব্য রচনা করেন এবং সাধারণ মানুষও কাব্য উপলব্ধি করিতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইঁহাদের মতটা বোঝানো যাইতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি সহজ সুন্দর কবিতা আছে—

A slumber did my spirit seal ;
I had no human fears :
She seem'd a thing that could not feel
The touch of earthly years.

> **No motion has she now, no force ;**
> **She neither hears nor sees ;**
> **Roll'd round in earth's diurnal course**
> **With rocks, and stones, and trees.**

এই কবিতাটির মধ্যে দুই-একটি প্রত্যক্ষ রূপক আছে। কিন্তু ইহার মাধুর্য রহিয়াছে প্রচ্ছন্নরূপকে। লুসির সঙ্গে পাহাড় পাথর ও গাছের পার্থক্যের অবধি নাই। সে একটি ক্ষুদ্র বালিকা, বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে তাহার কোনো সাদৃশ্য বা অন্তরঙ্গতা নাই। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহারা একাত্মতা লাভ করিয়াছে এবং এইখানেই কবিতাটির শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই প্রচ্ছন্নরূপকের মধ্যেই কবির কৌশল নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু এই মত সকল কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে এবং যেখানে ইহা প্রযোজ্য সেইখানেও ইহার দ্বারা সাহিত্যধর্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। প্রথমতঃ, স্বভাবোক্তিযুক্ত বাক্যে বা সন্দর্ভে— যেমন 'পাখি সব করে রব' প্রভৃতিতে— বিরোধের আভাস কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ, যদি বিরোধের অনুভবই কাব্যের মূল উপাদান হয় তাহা হইলে কষ্টকল্পনাযুক্ত বাক্য কাব্য হিসাবে প্রাধান্য পাইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে আপত্তিটা স্পষ্ট করা যাইতে পারে—

> আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী জাতা ততোঽনন্তরং
> মাতা সম্প্রতি সাম্বুরাশিরশনা জায়া কুলোদ্ভূতয়ে।
> পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্যা স্নুষা
> যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিদুষাং কিং ভূপতীনাং কুলে ॥

'হে নাথ, এই পৃথিবী একদিন আপনার পিতামহী ছিল, তার পর সে হইল আপনার মাতা। এখন আপনার কুলগৌরব বৃদ্ধির জন্য সেই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী আপনার জায়া হইয়াছে। বর্ষশত পূর্ণ হইলে সে হইবে আপনার অনিন্দ্যরূপা পুত্রবধূ। এই ব্যবহার সমগ্রনীতিকুশল

ভূপতিদের উপযুক্তই বটে।'

এই শ্লোকে পৃথিবীতে জায়াত্ব আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় মন বিরোধের সম্মুখীন হয় এবং একই রমণী পিতামহী মাতা জায়া ও পুত্রবধূ রূপে চিত্রিত হওয়ায় সেই বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে। অভিনবগুপ্ত এই শ্লোকের মধ্যে কাব্যত্ব দেখিতে পান নাই, বরং ইহা তাঁহার মনে অসভ্য স্মৃতির উদ্রেক করিয়াছে অর্থাৎ যে বিরুদ্ধতাকে ছাপাইয়া রূপক কাব্যত্ব লাভ করিতে পারে তাহা অনতিক্রান্ত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তিতে মূল সমস্যার সমাধান হইল না; শুধু প্রশ্নটি একটু ঘুরাইয়া করিতে হইবে। রূপকবাদী সমালোচকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব: বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে নৈসর্গিক বিরুদ্ধতা আছে, কোন্ শক্তির বলে কবিপ্রতিভা তাহা অতিক্রম করিয়া ইহাদের মধ্যে একাত্মতা আনয়ন করে?

৪

কুন্তক বলেন যে, কোনো বিশেষ অলংকারের মাধ্যমে কাব্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইবে না। সকলরকম অলংকার বা কাব্যসৌন্দর্যের প্রাণ হইল বক্রোক্তি। ভামহের মতো তিনি বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন নাই। সাহিত্যের সৃষ্টি শব্দ ও অর্থের অপূর্ব সমন্বয়ে। শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্যের নাম সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণ দিয়াছেন—অলংকার। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বভাবোক্তি বা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির স্বভাবের যথাযথ বর্ণন হইতে যে রসপ্রতীতি হয় তাহা লইয়া তাঁহারা গোলযোগে পড়িয়াছেন। এমন কোনো বস্তু নাই যাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নাই এবং সেই সৌন্দর্যের স্বরূপবর্ণনায় কে কাহার অলংকার হইবে? 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-জাতীয়

স্বভাববর্ণনা ও খুব জমকালো সালংকার বাক্য— ইহাদের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাইতে পারে? সেই সর্বসাধারণ-প্রযোজ্য লক্ষণ— কবির বলিবার কৌশল বা ভণিতির ভঙ্গি। ইহা শুধু শব্দের গুণ নহে বা শুধু অর্থের গুণ নহে। শব্দ ও অর্থের সম্মিলনে যে অপূর্বতা সৃষ্ট হয় তাহাই কাব্যের প্রাণ এবং তাহারই নাম বক্রোক্তি। প্রসিদ্ধ প্রস্থান পরিত্যাগ করিয়া কবি নূতন শব্দ ও নূতন অর্থের প্রয়োগ করেন; তাহাই সকল অলংকারের সৌষ্ঠব সম্পাদন করে এবং কোনো অলংকার না থাকিলেও এই বৈদগ্ধ্যময় ভঙ্গিই কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুমারসম্ভব হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করা যাইতে পারে—

> দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
> সমাগমপ্রার্থনয়া কপালিনঃ।
> কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
> স্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥

ব্রাহ্মণবেশী মহাদেব তপস্যারতা পার্বতীকে ছলনা করিয়া বলিতেছেন: 'কপালী মহাদেবের সঙ্গ কামনা করিয়া দুইটি বস্তু সম্প্রতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে— এক কান্তিমতী চন্দ্রকলা আর দ্বিতীয় এই জগতের নয়নজ্যোৎস্নারূপিনী তুমি।'

এখানে প্রত্যেকটি পদেই অভিনবত্ব আছে এবং যে-কোনো একটি পদ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্তে অন্য পদ বসাইলে কাব্যসৌন্দর্যের হানি হইবে। উদাহরণস্বরূপ 'কপালী' কথাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাদেবের সহস্র নাম আছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটি নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তথাপি কালিদাস যে সেই-সমস্ত প্রসিদ্ধ অভিধান বাদ দিয়া 'কপালী' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার কারণ ইহা জুগুপ্সাব্যঞ্জক; পার্বতীর মহাদেবের সঙ্গ-প্রার্থনার মধ্যে যে বীভৎসতা আছে তাহা

প্রমাণ করাই বক্তার উদ্দেশ্য। এই জাতীয় প্রয়োগই বক্রোক্তি এবং বলিবার এই ভঙ্গিই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। অলংকার, গুণ, রচনারীতি— ইহারা এই বলিবার ভঙ্গিরই নামান্তর এবং যেখানে প্রচলিত অলংকারাদি নাই অথবা যেখানে রচনারীতির প্রসিদ্ধ নিয়মাদির ব্যত্যয় হইয়াছে সেইখানেও যদি বলিবার বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকে তবে কাব্যানন্দের সঞ্চার হইবে।

বক্রোক্তির এই ব্যাখ্যাও বিচারসহ নহে। প্রথমত, ইহা স্ববিরোধিতা-দোষদুষ্ট। বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রসিদ্ধ অভিধান-ব্যতিরিক্ত অভিধা, আবার ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহা বস্তুর স্বভাবের বর্ণন। তবে কি মনে করিব যে, স্বভাবের অস্বাভাবিক বর্ণনাই বক্রোক্তির বৈশিষ্ট্য? সুকুমার মার্গের বিবরণ প্রসঙ্গে কুন্তক বলিয়াছেন যে, কবিপ্রতিভা নব শব্দার্থের সৃষ্টি করিলেও বস্তুর স্বকীয় স্বভাবের সৌন্দর্যে কবির কৌশল আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর স্বভাব সহজভাবে প্রকাশিত হইলেই তাহার স্বকীয়তা সমধিক পরিস্ফুট হইবে এবং এই-সকল ক্ষেত্রে বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে কষ্টকল্পনারই পরিচয় দেওয়া হইবে। কুন্তকের আলোচনায় এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। বক্রোক্তি-বাদের বিরুদ্ধে আর-একটি আপত্তি আছে তাহা অখণ্ডনীয় এবং কুন্তক সেই আপত্তি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। যে-কোনো রকমের বক্রোক্তিই কাব্য হইতে পারে না। তাহা হইলে কাব্যরচনা খুব সহজ হইয়া যাইত, কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ শব্দ এবং অভিধান দেখিয়া তাহাদের উদ্ভট অর্থ বাহির করিয়া তাহাদিগকে কাব্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সম্ভব হইত। এই ব্যাখ্যা এইভাবে গ্রহণ করিলে কষ্টকল্পনা, অসম্বদ্ধতা কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই আপত্তি খণ্ডন করার জন্য আলংকারিকেরা বলেন যে, যে-কোনো বক্রতাই

কাব্য হইবে না; যে বক্রোক্তি সমঝদার বা সহৃদয়ের মনে আনন্দ জাগাইতে পারে তাহাই কাব্যে গ্রহণীয়; যিনি কাব্যশাস্ত্র জানেন সেই তদ্বিদের আহ্লাদই কাব্যবিচারে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সহৃদয় হইতেছেন সেই ব্যক্তি, পুনঃ পুনঃ কাব্যাস্বাদনের ফলে যাঁহার চিত্ত মুকুরের মতো স্বচ্ছ হইয়াছে; যে-কোনো কাব্যই তাহার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এই চুক্তির মধ্যে যে চক্রক-দোষ আছে তাহার প্রতি লক্ষ করিলেই এই ব্যাখ্যার উপহসনীয়তা প্রমাণিত হইবে। সহৃদয় হইতেছেন সেই ব্যক্তি যিনি কাব্য উপলব্ধি করেন; আর কাব্য হইতেছে সেই বস্তু যাহা সহৃদয় ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন যে, কাব্যের আসল মানদণ্ড ঔচিত্য। যে পথেই কবি বা পাঠক অগ্রসর হউন-না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে উচিত-অনুচিত বিচার করিয়াই চলিতে হইবে। কবি কোন্ জাতীয় বিষয় নির্বাচন করিবেন, ইতিহাস হইতে বিষয় সংগ্রহ করিলে তিনি কতটা স্বাধীন কল্পনার অনুপ্রবেশ করাইবেন, কিরকম নায়ককে কোথায় বসাইবেন, কোন্ রসের অঙ্গহিসাবে কোন্ রস পরিবেশন করিবেন, কোথায় সমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগ করিবেন এবং কোথায় সমাসহীন পদ অধিকতর আনন্দদায়ক হইবে— ইহার একমাত্র নিয়ামক ঔচিত্যবোধ। যেখানে যাহা উচিত, কবি তাহাই করিবেন; মানুষকে মানুষের মতো করিয়া সৃষ্টি করিবেন, দেবতাকে দেবতার মতো; তাহা হইলে ঔচিত্যের হানি হইবে না। অনেক সময় কবি প্রচলিত রচনারীতি পরিহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার এই স্বাধীনতা তখনি স্বীকৃত হইবে যদি দেখা যায় যে তিনি ঔচিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু ঔচিত্য কাব্যের নিয়ামক নহে, ইহা কবিকৃতির অন্যতম ফল। মৌলিক প্রতিভা-সম্পন্ন প্রত্যেক সাহিত্যিকই নূতন ঔচিত্যের সৃষ্টি করেন। দেবতার সম্ভোগ-বর্ণনা অনুচিত বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু কালিদাস এই

নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কুমারসম্ভব রচনা করিলেন। তাঁহার কাব্য নূতন ঔচিত্য রচনা করিল। পার্থিব জীবনে প্রেতাত্মা বা শ্মশ্রুবিশিষ্ট ডাইনী-বুড়ির আবির্ভাব নিশ্চয়ই অসম্ভব, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকে ইহারা যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে; ইহারা আমাদের ঔচিত্যবোধকে পীড়িত করে না। মাইকেল রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে রাম ও লক্ষ্মণ অপেক্ষা মহত্তর চরিত্ররূপে কল্পনা করিয়া ঔচিত্য-বিরোধী কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যের বৃহত্তর ঔচিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। সুতরাং ঔচিত্যের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য অবিচল নিয়ম থাকিতে পারে না।

যাঁহারা ঔচিত্যকে কাব্যের নিয়ামক মনে করেন তাঁহারা কাব্য-সৃষ্টির (অথবা কাব্যোপলব্ধির) মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী ক্রম আছে তাহার প্রতি লক্ষ করেন না। প্রথমে সাহিত্যিকের অপূর্ব নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনা করে এবং পরে স্রষ্টা ও সহৃদয় তাহার মধ্যে ঔচিত্য দেখিতে পান। এই ঔচিত্যবোধের জন্য পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না; ইহা সৃষ্টি ও উপলব্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঔচিত্যের বিচারই করিতে হয় তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা কাব্যের অঙ্গ মাত্র; ইহা কবিপ্রতিভার ফল, তাহার নিয়ামক নহে। ইহাকে স্বতন্ত্র মানদণ্ডরূপে উপস্থাপিত করা যায় না।

অলংকার, গুণ, রীতিসৌষ্ঠব, বক্রোক্তি, সামঞ্জস্য, ঔচিত্য— সৎসাহিত্যে এই-সকল বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যাইবে, কিন্তু এই-সকল প্রস্থানের সাহায্যে কাব্যের মূলে পৌঁছাইতে পারা যাইবে না। এই-সকল প্রস্থানকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের সংজ্ঞা দিলে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি, উভয় দোষই দেখা যাইবে অর্থাৎ এমন অনেক বস্তু এই-সকল সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ঞিত হইবে যেখানে কাব্যত্ব নাই, আবার অনেক

সংকাব্য এই জাতীয় সংজ্ঞায় বাদ পড়িয়া যাইবে। সর্বাপেক্ষা বড়ো আপত্তি এই যে এই-সকল প্রস্থানে কাব্যের অন্তর-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কাব্যের (বা অন্য যে-কোনো বস্তুর) সংজ্ঞা দিতে হইলে প্রথমে তাহার প্রধান লক্ষণগুলির নির্দেশ দিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সাহিত্যের লক্ষণ

সাহিত্যে মানুষ মনোগত ভাব প্রকাশ করে অথবা জীবনে যেরূপ ঘটনা ঘটে তাহার অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা দেয়। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্যের প্রকাশ ও জীবনের প্রকাশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনা জীবনের ঘটনা হইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর। শাস্ত্র-ইতিহাসাদিতে আমরা মতামত প্রকাশ করি, সাহিত্যিকও তাঁহার রচনার মধ্যে নানাবিধ মতামত প্রকাশ করেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈষম্য আছে বলিয়াই সাহিত্য সাহিত্য, দর্শন দর্শন।

সাহিত্যের একটি লক্ষণ এই যে, সাহিত্যে শোকের প্রকাশ আনন্দ দান করে। সাহিত্যের আস্বাদ লৌকিকজগতের আনন্দ হইতে বিভিন্ন —সেই কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আবার ইহাও সত্য যে সাহিত্যে দুঃখের প্রকাশে আমরা দুঃখ পাই না; বরং ট্রাজেডিকে আমরা মহত্তম সাহিত্যপ্রচেষ্টা বলিয়া মনে করি। মা যখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মৃত শিশুর জন্য কাঁদেন তখন তিনি শোকের গৌরব প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাঁহার গভীর ও তীব্র শোক ঐভাবে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি যদি কবি হন তাহা হইলে এই প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে তিনি আবার অন্যপ্রকারে শোক প্রকাশ করিতে পারেন। এখানেও উচ্ছ্বাস ও তীব্রতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস ও তীব্রতা অন্যজাতীয়। এইখানে শোকের গৌরব প্রকাশিত হইবে এবং এই প্রকাশে পার্থিব শোকের বেদনাতুরতা চলিয়া যাইবে। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে তখনি তাঁহার মুখ হইতে অনুষ্টুভ্‌ছন্দে

নির্গত হইল— মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। কিন্তু তবু আমাদের মনে হয় যে, যে ঋষি শোক অনুভব করিয়াছিলেন এবং যে কবি সেই শোকের কাব্যময় অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথক ব্যক্তি। ইঁহাদের শোকের মধ্যে যে ক্রম আছে তাহা খুবই সামান্য, কিন্তু সেই ক্রম অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে শোক আনন্দময় বা আস্বাদগোচর হইত না। এই শোকের কাহিনীতে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমত, সহচরী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চ আর্তনাদ করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, ঋষি বাল্মীকি সেই শোকের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়াছেন; তৃতীয়ত, কবি বাল্মীকি এই শোকের বিষাদময় মোহমন্ত্রজাল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন কাব্যের নির্লিপ্ত আনন্দলোকে।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকেরা সাহিত্যিক উপলব্ধির নির্লিপ্ততার প্রতি লক্ষ করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন— মানসিক দূরত্ববোধ বা **psychical distance**। তাঁহাদের মতে, '**...in poetic and artistic activity the peculiarity lies in that the personal character of the relation (between the self and the object) has been filtered. It has been cleared of the practical, concrete nature of its appeal.**'[১] এই দূরত্ব-বোধের বিস্তৃততম ব্যাখ্যা দিয়াছেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলেন যে, রসানুভূতি অন্য সব অনুভূতি হইতে পৃথক। ইহা চিত্তের একটি স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থিত থাকে। বাস্তব জগতে যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় আমরা সেই-সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া থাকি। আমার মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে

---

১ **E. Bullough, *British Journal of Psychology*, Vol. V. June 1912.**

তাহা ভয়ের বস্তুর উপরে যেন লিখিত আছে। সেইজন্যই উহা ভয়ানক বা ভীষণ। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের যে সম্পর্ক বস্তুর সহিত অনুভবেরও সেই সম্পর্ক; আমার অনুভব অনুভূত বস্তুর বিশেষণ। সে কখনো মুক্তির আস্বাদ পায় না, বস্তুর চাপে সে ভারাক্রান্ত। কিন্তু ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি সেই-সব অনুভবকে যাহাদের বিষয় অপরের অনুভব, কোনো বস্তু নহে, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, অনুভব অপেক্ষাকৃত বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহানুভূতি এই জাতীয় অনুভূতি; ইহার নামেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার বিষয় অপরের অনুভূতি। নিহত ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চের শোকের বিষয়, কিন্তু (কবি বাল্মীকির কথা এখন ছাড়িয়া দিলাম) ঋষি বাল্মীকির শোকের বিষয়—নিহত ক্রৌঞ্চী নহে, রোরুদ্যমান ক্রৌঞ্চ। ক্রৌঞ্চের শোক যেমন নিহত সহচরীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ও তদ্দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া আছে, ঋষির শোক সেইরূপভাবে ক্রৌঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না। ইহার মধ্যে মুক্তির স্পর্শ আছে, কারণ ইহা ভাবজগতের সামগ্রী। ইহা যেন আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে, বস্তুর বন্ধন ইহাকে সীমিত করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেন, সহানুভূতি অনুভূতির চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত মুক্ত।

কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে সহানুভূতি বস্তুনিরপেক্ষ হইতে পারে না। ঋষি বাল্মীকি যখন শুধু ক্রৌঞ্চের দুঃখে দুঃখী হইয়াছিলেন তখন তিনি সেই ক্রৌঞ্চের কথাই ভাবিতেছিলেন; তিনি নিহত ক্রৌঞ্চী হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলেন, শোকবিহ্বল ক্রৌঞ্চ হইতে নহে। কিন্তু যদি মনে করা যায় কোনো ব্যক্তি বাল্মীকির সহানুভূতির সঙ্গে সহানুভূতি করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অনুভব বস্তু হইতে অসম্পৃক্ত হইয়া অনেক দূরে সরিয়া যাইয়া থাকিবে। এই তৃতীয়

ব্যক্তিই কবি বাল্মীকি (ক্রৌঞ্চ— ঋষি বাল্মীকি— কবি বাল্মীকি)। ইহার অনুভব বস্তুনিরপেক্ষ— ক্রৌঞ্চীর নিধন অর্থাৎ বস্তুজগৎ ইহার রূপকমাত্র। এইজন্যই কুৎসিত বস্তু কবির কল্পনায় সুন্দর হইতে পারে, শোক আনন্দময় চর্বণার বিষয় হইতে পারে।[১] রোজার ফ্রাই বলেন, **'Art demands the most complete detachment from the meanings and implications of appearances. If, for example, we look at a sung bowl, we approach gradually its outside contour, the perfect sequence of its curves···. Such apprehension is unconditioned by notions of space and time or by moral, economic and scientific theories.'** অর্থাৎ কোনো বস্তুর যে রূপ তাহা যখন সেই বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত হয় তখনি তাহা রসানুভূতির বিষয় হইতে পারে।

এই দূরত্ববোধের জন্যই কাব্য দেশকাল-অনালিঙ্গিত, অর্থাৎ তাহা সর্বদেশের ও সর্বকালের। এই কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। কেহ কেহ বলেন, কালিদাস কবে কোথায় জন্মিয়াছিলেন অথবা মরিয়াছিলেন তাহার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, কিন্তু তাঁহার কাব্যের ব্যাপ্তির সীমা নাই, তাহা চিরনবীন; সম্রাট শাজাহান চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাজমহল অমর; এই যুক্তি বিচারসহ নহে। তাজমহলের আয়ু শাজাহানের চেয়ে বেশি, তাহার কারণ পাথর মানুষের মতো ক্ষণভঙ্গুর নহে, কিন্তু পাথরও অবিনশ্বর নহে। আজ যে কাব্যকে আমরা খুব বড়ো বলিয়া মনে করিয়া বাহবা দিই, দুইদিন পরেই

১ দ্র. **K. C. Bhattacharyya,** ***Studies in Philosophy,*** **Vol. 1. pp. 349-63**

তাহা বাসী বলিয়া মনে হয়, আজ যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় কাল তাহা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। জনগণের বিচারই যদি অমৃতত্বের নিদর্শন হয় তাহা হইলে কোনো কালেই স্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌছান যাইবে না। অথচ আমরা যখন কাব্য পাঠ করি অথবা কবি যখন রসাপ্লুত হন তখন ক্ষণিকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই অনন্তের আস্বাদ পাওয়া যায়। এই অনুভূতিকেই কীট্‌স্ প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে :

Thou wast not born for death, immortal Bird !
No hungry generations tread thee down ;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown :
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home
She stood in tears amid the alien corn ;
The same that oft-times hath
Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে পাখির গান কবি শুনিয়াছিলেন সে অমর নহে, সে হয়তো কবির চেয়েও ক্ষণজীবী ; পক্ষিজাতিও মনুষ্যজাতি হইতে দীর্ঘায়ু নহে এবং কবিও পক্ষিজাতির কথা বলিতেছেন না। তিনি একবচনের প্রয়োগ করিয়া ইহাই বলিতে চাহেন যে, তাঁহার এই মুহূর্তে যে আনন্দোপলব্ধি হইতেছে তাহা অমর। এই-যে ক্ষণিক নিত্যতা, ইহাই সাহিত্যের সারবস্তু। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে, আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে যে রয়ে গেল সেখানে আমাদের

দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মুহূর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে—আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।'

সাহিত্য শুধু যে ক্ষণিক অনুভূতিকেই নিত্যতা দেয় তাহা নহে, কোনো এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে বিশ্বজনের অন্তরের সামগ্রীতে রূপান্তরিত করে। ইহাই প্রকৃত সহিতত্ব বা সাহিত্য। বিজ্ঞান বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে ঐক্যসূত্র যোজনা করে এবং সামাজিক জীবনে আমরা পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত হইয়া বাস করি। কিন্তু সাহিত্যের সহিতত্ব বাস্তবজীবনের সম্পর্ক হইতে অন্যধরনের। এই সহিতত্ব আমরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অনুভব করি, কিন্তু কবিই হই আর পাঠকই হই ইহাও মনে করি যে এই অভিজ্ঞতা বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মতো নয়, কারণ ইহা আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা হাসি-কান্নার অতীত। শাজাহান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে কোঠাতেই রাখুন, তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।' দার্শনিক ক্রোচে বলেন, শিল্পী ব্যক্তিগত অনুভূতির বন্ধন হইতে মুক্তি পান তাঁহার রূপসৃষ্টির মধ্য দিয়া। নানা ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠে, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি সেই ভাবকে রূপ দিতে পারিলেন অমনি তাঁহার অন্তরস্থিত ভাব বহির্বিশ্বে মূর্তি গ্রহণ করিল এবং সেই মূর্তির মধ্য দিয়া তিনি আপন অন্তরের বেদনা হইতে মুক্তি পাইলেন। দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য রসোপলব্ধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন Heart Universal বা বিশ্বজনীন চিত্তের পরিকল্পনা করিয়া। রসাপ্লুত কবি অথবা রসবেত্তা পাঠক উপলব্ধি করেন যে, এই অনুভূতি বিশ্বের অনুভূতি এবং নিজের খণ্ডিত, আত্মসচেতন

অনুভূতি হইতে বিযুক্ত হইয়াই তিনি এই সার্বিক অনুভূতির অংশীদার হইতে পারেন।

২

সাহিত্যে বা শিল্পে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহা লৌকিক জীবনে প্রকাশিত ভাব হইতে বিভিন্ন। ইহার প্রধান কারণ লৌকিক জীবনে যে-ভাব প্রকাশিত হয় তাহা বিশেষভাবে ভাবাচ্ছন্ন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্পে ও সাহিত্যে যে-ভাব প্রকাশিত হয় তাহা সামাজিক সম্পদ। মুনি বাল্মীকি শোকাচ্ছন্ন হইয়া যে কবিতা রচনা করিলেন তাহার সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, 'মনে রাখিতে হইবে, ইহা মুনির শোক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে সেই দুঃখে তিনিও দুঃখিত হইতেন··· ইহা যে রস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তাহার লক্ষণ এই যে, ইহা লৌকিক শোক হইতে পৃথক এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা আস্বাদিত হইতেছে তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে যেমন জল উছলিয়া পড়ে তেমনি চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃষ্যন্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়···।' সুতরাং যে-ভাব শিল্পে কাব্যে প্রকাশিত হয় তাহার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে; তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিলে চলিবে না। বাস্তবজীবনে রাজা দুষ্মন্ত ও আশ্রমবালিকা শকুন্তলা যে প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন তাহা দুইটি ব্যক্তির ব্যাপার, কিন্তু কালিদাসের নাটকে যে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে দেখিতে পাই তাঁহাদিগকে আমরা ততটা ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া মনে করি না, তাঁহারা রতিভাব প্রকাশের বা শৃঙ্গাররস প্রতীতির আলম্বন বা আশ্রয় মাত্র। ইঁহাদিগকে ভাবের আলম্বন বলিয়া মনে করি বলিয়াই ইঁহাদের লজ্জা দৈন্য প্রভৃতি অস্থায়ী সঞ্চরণশীল ছোটো ছোটো ভাব এবং রোমাঞ্চ প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ বিশেষ

তাৎপর্য লাভ করে, কারণ ইহাদের মাধ্যমেই শৃঙ্গাররসের প্রতীতি সম্ভব হয়। যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার রতি নহে— ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সার্বজনীন রতিভাব। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা রতিভাবের বিভাব এবং নাট্যবিভাবের— বাস্তবজীবনের দুষ্মন্ত শকুন্তলার নহে— লজ্জাদৈন্য প্রভৃতি সঞ্চারীভাব এবং রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারাই ভাব অভিব্যক্তি লাভ করে। এইজন্যই ভরতমুনি সূত্রযোজনা করিলেন, 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়।'

এই সুচিরপরিচিত সূত্রে ভাবের উল্লেখ নাই। হৃদয়ের ভাব পার্থিব বস্তু; তাহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার আস্বাদন সম্ভব হয় না। ভাব যখন রসে পরিণত হয় তখন তাহা আমাদিগকে জ্ঞানের অতীত অপার্থিব লোকে উন্নীত করে। যদি রস জ্ঞেয় পদার্থই হইত তাহা হইলে আমরা বিভাবাদির সাহায্যে অপর এক ব্যক্তির মনের অবস্থা জানিতাম এই পর্যন্ত; ইহার দেশকাল-অনালিঙ্গিত অপরূপ রূপের পরিচয় পাইতাম না। রস ব্যক্তিনিরপেক্ষ অলৌকিক বস্তু। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইতে পারে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাই রাজা দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার রথের সম্মুখ হইতে এক মৃগ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছে এবং এই ভয়বিহ্বল পলায়মান মৃগের অতি অপরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই ভয় কাহার— মৃগের না আমাদের? যদি ইহা শুধু মৃগের ভয়ই হইত আমরা অনেকটা উদাসীন থাকিতাম অথবা একটু 'আহা! উহু!' করিয়া ক্ষান্ত হইতাম। এই বর্ণনায় আমরা তন্ময় হইতাম না। আর যদি ইহা মৃগের মতো আমাদের ভয় হইত অর্থাৎ আমরা যদি মৃগের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও পলায়ন করিতাম; পলায়ন না করি, অন্ততঃ পলায়নের বৃত্তান্তে

মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। সাহিত্য এক পরমাশ্চর্যময় পদার্থ, ইহাতে আমরা যুগপৎ তন্ময় ও আত্মসচেতন থাকি। ইহার উপলব্ধি স্বগতও বটে পরগতও বটে। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে বহুযুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানুষের চিত্তে, তাহার মস্তিষ্কে তাহাদের রেখাপাত করিয়াছে এবং সেইজন্য কতকগুলি ভাব, কতকগুলি চিত্র— যেমন পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক— তাহার কল্পনাকে সহজে উদ্‌বোধিত করে এবং এই যুগযুগ-সঞ্চিত ভাব ও চিত্রই কাব্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও মানিতে হইবে, কবির সেই শক্তি আছে যাহার বলে তিনি মানবের বহুদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে স্বীয় অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করিতে পারেন এবং যাহা সর্বসাধারণের তাহাকে আমরা একান্ত আপনার করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এই যে উপলব্ধি যাহা নিকটকে দূর করিয়া দেয় আবার যাহা সর্ব-সাধারণের তাহাকে আপনার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রূপান্তরিত করে, যাহা ক্ষণের মধ্যে অনন্তের আস্বাদ দেয়, যাহা একান্ত ব্যক্তিগত অথচ একেবারেই ব্যক্তিস্বভাববর্জিত— ইহারই নাম রস। রসের প্রধান গুণ এই যে, ইহা অ-লৌকিক। লৌকিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা হয় আচ্ছন্ন হইব না হয় উদাসীন থাকিব। কিন্তু রস স্বগতও নয়, পরগতও নয়। সুতরাং রসোপলব্ধি একই সময়ে আবেশ ও ঔদাসীন্যের সঞ্চার করে।

৩

রস অ-লৌকিক। সাধারণত অ-লৌকিক বলিতে আমরা বুঝি এমন-কিছু যাহা পরমাশ্চর্যময়, যাহা মনুষ্যে সম্ভবে না। রস মানুষের সৃষ্টি, মানুষের উপলব্ধিই তাহার আশ্রয়। তাহার মধ্যে বিস্ময়কর বস্তু থাকে,

কিন্তু বিস্ময়করতা তাহার প্রধান লক্ষণ নহে। ইহা অ-লৌকিক, কারণ ইহা লৌকিক জীবনের উপলব্ধি হইতে পৃথক। সাধারণত আমরা বলিয়া থাকি যে সাহিত্য আনন্দ দান করে। এই আনন্দ যে লৌকিক সুখের আনন্দ নহে সেই সম্পর্কে মতবিরোধের অবকাশ নাই। এই কারণেই কুৎসিত বীভৎস দুঃখজনক বিষয়ও যখন রসোত্তীর্ণ হয় তখন তাহা আর কুৎসিত বীভৎস বা দুঃখজনক বলিয়া মনে হয় না।

কুৎসিত বা দুঃখজনক বস্তু কেমন করিয়া রসোত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ-দায়ক হয় তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে; এই আলোচনা রসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সাহায্য করিবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে লৌকিক জীবনেও হিংস্র দুঃখজনক ব্যবহারে আমরা আনন্দ পাই, তাহা না হইলে পরনিন্দা এত মুখরোচক হইত না এবং মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হইত না। ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি হেয় চরিত্র আমাদের মনে যে অবজ্ঞার ভাব সঞ্চারিত করে সেই ভাবটাই উপভোগ্য। দুঃখের অনুভূতি আমাদের চিত্তে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সেই আলোড়নের মধ্য দিয়া নিজেকে গভীরভাবে জানা যায়। দুঃখের মধ্যে এই যে 'আমি আছি'— অথবা অস্মিতাবোধ আছে— ইহাই আনন্দের কারণ। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু— ইহার মধ্যে ভালো কিছুই নাই, কিন্তু ইহা লইয়া অগণিত কাব্য রচিত হইয়াছে। রসিক চিত্ত ইহাতে আনন্দ পাইয়াছে, কারণ ইহার মধ্যে আছে বেগবান্ অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানু-ভূতি। বার্নার্ড শ হাস্যরসের রাজা; কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন, নিছক হাস্যরসের মধ্য দিয়া কোনো সাহিত্যিকের অন্তরতম পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই পরিচয় পাওয়া যাইবে ট্রাজেডিতে বা দার্শনিক মতবাদপুষ্ট কমেডিতে।

দুঃখের কাব্য আমাদের চিত্তে কেন আনন্দ দেয় তাহার ব্যাখ্যা আমরা পাইব যদি আমরা রসের অ-লৌকিকত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকি। লৌকিক জীবনে আমরা পরনিন্দায় যে আনন্দ পাই অথবা অপরের নিগ্রহে কেহ কেহ যে হিংস্র সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে ট্রাজেডির আনন্দের তুলনা করা ভুল; সাহিত্যের আনন্দ যে-কোনো লৌকিক আনন্দ হইতে পৃথক। পরপীড়নে আমরা যে আনন্দ পাই আর ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যুতে বা সীতার পাতাল-প্রবেশে আমরা যে আনন্দ পাই ইহাদিগকে সমশ্রেণীতে গণ্য করিলে সাহিত্যের প্রতি অবিচার করা হয়। ভাঁড়ু দত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাও যুক্তিসহ নহে। সৃষ্টির আনন্দ আর অবজ্ঞার আনন্দ এক বস্তু নহে। ফল্‌স্টাফ্ চোর মাতাল লম্পট মিথ্যাবাদী ও ভীরু, কিন্তু শেক্সপীয়র এই চরিত্রের মধ্য দিয়া অবজ্ঞার আনন্দ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন এমন কথা কেহ বলিবেন বলিয়া মনে করি না। বার্নার্ড শ বলিয়াছেন যে হাস্যরসের মধ্য দিয়া স্রষ্টার অন্তরতম পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ফল্‌স্টাফের দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করা যায়। ফল্‌স্টাফের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অন্তরের গভীর ছাপ নাই এইরূপ অনুভব কাহারো হয় কি? রবীন্দ্রনাথের অপর যুক্তি যে দুঃখের কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা গভীরভাবে আপনাকে জানি, দুঃখের বেগবান্ অভিজ্ঞতা আত্মানুভূতির আনন্দের সঞ্চার করে, তাহাও গ্রাহ্য নহে। বহুকাল পূর্বে আলংকারিকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে বাল্মীকি যদি দুঃখসন্তপ্তই হইতেন তাহা হইলে তিনি কাব্য রচনা করিতেন না। ক্রৌঞ্চের মতো আর্তনাদ করিতেন। মা যে উচ্চৈঃস্বরে মৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করে তাহার কারণ ইহা নয় যে সে শোকের গৌরব প্রকাশ করিতে চাহে; ইহাই যে তাহার শোকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে কবি পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করেন

তিনি শোকের দ্বারা অভিভূত হন না। শোকের বেদনাবোধের মধ্যে যদি কবি এবং রসিক পাঠক আত্মানুভূতির আস্বাদই পাইতেন অর্থাৎ উহাকে যদি নিজের শোক বলিয়াই মনে করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের রসবোধ জাগ্রত হইত না।

সাহিত্য ও শিল্পে দুঃখের কাহিনীতে যে আমরা আনন্দ পাই তাহার কারণ ইহা অ-লৌকিক, দুঃখের কাহিনীর মধ্যে আমরা মানবহৃদয়ের অপরূপ প্রকাশ দেখিতে পাই। সেই প্রকাশ দেশকাল-অনালিঙ্গিত, আত্মানুভূতি হইতে মুক্ত। ম্যাথু আর্নল্ড স্বরচিত ***Empedocles on Etna*** সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'What then are the situations, from the representation of which, though accurate, no poetical enjoyment can be derived? They are those in which the suffering finds no vent in action, in which there is everything to be endured, nothing to be done. In such situations there is inevitably something morbid, in the description of them something monotonous. When they occur in actual life, they are painful, not tragic; the representation of them in poetry is painful also.'

ইয়েট্স্ আধুনিক ইংরেজি কবিতার সংকলন করিতে যাইয়া যুদ্ধের কাব্য বাদ দিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মতে নিছক দুঃখকষ্ট (**passive suffering**) কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। যে-সমস্ত দৃষ্টান্তে ম্যাথু আর্নল্ড ও ইয়েট্স্ তাঁহাদের মত প্রয়োগ করিয়াছেন সেই-সমস্ত দৃষ্টান্ত সার্থক কাব্য হইয়াছে কি না সেই প্রশ্ন না তুলিয়াও এই যুক্তির যাথার্থ্য মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ট্র্যাজেডিতে আমরা যে গভীর আনন্দ পাই তাহার কারণ প্রতিভাবান কবির

কাব্যে বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া মানবাত্মার অপরাজেয়তাই সমধিক পরিস্ফুট হয়। কীট্‌স্‌ বলিয়াছেন, রাস্তার ঝগড়া কুৎসিত, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া যে তেজ অভিব্যক্ত হয় তাহা সুন্দর। কবির প্রতিভা সমস্ত ব্যাপারটিকে অ-লৌকিক রাজ্যে লইয়া যায়, যেখানে শুধু মানবচরিত্রের রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়, কারণ কাব্যবর্ণিত চরিত্রগুলি ভাবের বিভাব মাত্র, তাহারা সাধারণ নরনারী নহে। যে নাটকে বা কাব্যে অ-লৌকিক উপলব্ধি জাগ্রত হয় নাই, সেই নাটক বা কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল্‌ ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার আংশিক আলোচনা করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডি আমাদের মনে ভয় ও অনুকম্পা জাগ্রত করিয়া এই দুইটি প্রবৃত্তির ক্যাথারসিস্‌ বা পরিশোধন সম্পাদন করে। তিনি ক্যাথারসিস্‌ বলিতে কী বুঝিয়াছিলেন তাহা লইয়া বহু বাদবিতণ্ডা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই পরিশোধন নৈতিক, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার উপমা পাওয়া যায় ধর্মোন্মাদনার উপশমে; অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ক্যাথারসিসের ব্যাখ্যার সূত্র পাওয়া যাইবে শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ধর্মের কথা শুনিতে শুনিতে বা ধর্মের গান শুনিতে শুনিতে মূর্ছাহত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদিগকে সেই ভাবাবেশ হইতে মুক্ত করিতে হইলে ঠিক সেইরকম সংগীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয় যাহা তাঁহাদের সমাধি বা মূর্ছা আনয়ন করিয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও এই মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রোগের যে-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই উদ্রিক্ত করিলে যে-বিষ ভিতরে আছে তাহা বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগের উপশম হইবে। আমাদের হৃদয়ে নানাবিধ প্রবৃত্তি আছে— ভয় ও অনুকম্পা তাহাদের অন্যতম। ইহারা বেদনাদায়ক। ভয়ের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, অনুকম্পাও পীড়াদায়ক,

কারণ অপরের দুঃখের জন্য দুঃখিত হইলেই অনুকম্পা জাগ্রত হয়। ট্র্যাজেডিতে যে কাহিনী বর্ণিত হয়, যে ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়, যে-সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহা হইতে আমাদের হৃদয়ে নাটকোল্লিখিত নায়ক-নায়িকার জন্য তীব্র অনুকম্পা উদ্‌বোধিত হয় এবং ভয়ও হয় যে, আমরাও তো এইরূপ মানুষ এবং অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে আমাদেরও তো এই দশা হইতে পারে! এইভাবে ভয় ও অনুকম্পার উদ্রেক হইলে, ইহাদের মধ্যে যে বেদনাদায়ক আতিশয্য আছে তাহা নির্গত হইয়া যায় এবং চিত্ত সুস্থ প্রশান্ত অবস্থা লাভ করে। মিল্‌টন এই ভাবটি খুব সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন *Samson Agonistes*-নাটকের শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে :

> **His servants he, with new acquist**
> **Of true experience, from this great event**
> **With peace and consolation hath dismissed,**
> **And calm of mind, all passion spent.**

ট্র্যাজেডিতে আমাদের যে নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা হয় তাহার ফলে ভাবের উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য ব্যয়িত হইয়া যায় এবং তাহার জায়গায় আসে— গভীর স্থৈর্য। ইহাই ট্র্যাজিক কাব্যপাঠের নৈতিক লাভ।

যদি মনে করা যায় যে আমাদের অন্তরস্থিত বেদনাদায়ক ভাবগুলিকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রশমিত করা কাব্যের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মধ্যপথে সেই ভাবগুলি— ট্র্যাজেডিতে ভয় ও অনুকম্পা— অধিকতর বেদনাদায়ক হইবে এবং পরে অবিচলিত শান্তি নামিয়া আসিবে। এই মত মানিয়া লইলে ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বেদনাবোধ করিব, তার পর সেই বেদনাবোধ ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইলে শান্তি ও আনন্দানুভূতি জাগ্রত হইবে। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে এই জাতীয় অভিজ্ঞতা

হইলে কেহ ট্র্যাজেডি উপভোগ করিতে পারিত না। বাস্তবিকপক্ষে, ট্র্যাজেডিতে যখন বেদনাবোধ জাগ্রত হয় তখনো তীব্র আনন্দ অনুভব করি বা রসাস্বাদ করি। ট্র্যাজেডির শেষভাগে অনুভূতির আবেগ আংশিকভাবে প্রশমিত হইতে পারে, নাও পারে; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, যেখানে ট্র্যাজেডি সবচেয়ে বেদনাদায়ক, সেইখানে সে তীব্রতম আনন্দের বাহন। ইহার কারণ এই যে, বেদনাময় মুহূর্তেও আমরা অনুভব করি যে, এই অভিজ্ঞতার অংশীদার হইলেও ইহা আমাদের স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ না করিলেও ইহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু লৌকিক জীবনের স্ববিরোধিতা অ-লৌকিক জগতে অপ্রযোজ্য। ট্র্যাজেডি আমাদের মনে সহানুভূতি বা অনুকম্পার উদ্রেক করে এইরূপ বলিলে ভুল হইবে, কারণ সহানুভূতি বা অনুকম্পা উদ্রিক্ত হয় পরের জন্য, ট্র্যাজেডির নায়কের দুর্ভাগ্য তো আমরা নিজের বলিয়াই মনে করি অথচ ইহাও মনে করি যে, যে-আমি এই তন্ময়তা লাভ করিতেছে, সেই-আমি আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ সত্তা নহে, তাহা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এমন কথা বলাও ঠিক হইবে না কারণ ব্যক্তিগত ভয় এখানে বিশ্বজনীন বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তাহার ক্ষণিক নিত্যতা, সুদূর নৈকট্য এবং সার্বভৌমিক ব্যক্তিত্ব। ইহাকেই আলংকারিকগণ অ-লৌকিক আখ্যা দিয়াছেন এবং এই অ-লৌকিকত্বকে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্যের সংজ্ঞাদানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব

'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'

অ-লৌকিক রসের ভিত্তি লৌকিক অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা। শিল্পী ও কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কতকগুলি উপকরণের সাহায্যে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতাকে রসলোকে উন্নীত করেন। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা এবং যে-সব উপকরণের সাহায্যে কবি ও শিল্পী এই অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করেন— ইংরেজিতে ইহাদিগের উভয়ের নাম material। কিন্তু এই দুইটি বিভিন্ন বস্তু এবং কাব্য ও শিল্পে ইহাদের স্থান পৃথক ভাবে নির্ণয় করিতে হইবে।[১] কোনো কোনো শিল্পী রঙ ও তুলি দিয়া চিত্র আঁকেন, কোনো কোনো শিল্পী ইঁট বা পাথর দিয়া সৌধ নির্মাণ করেন, কোনো কোনো শিল্পী মূর্তি গড়েন, কেহ কেহ ধ্বনিতরঙ্গের সাহায্যে সংগীত রচনা করেন।

১ 'Material'-শব্দের দুইটি অর্থের মধ্যে পার্থক্য না করিলে যে বিভ্রমের সৃষ্টি হয় তাহার দৃষ্টান্ত,··· 'শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের এই সত্যসম্বন্ধে লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন এ কথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে এও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না।' (অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা)। উদ্‌ধৃত মন্তব্যে উপাদান ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই। যে বাস্তব সত্যকে শিল্পী রূপ দেন তাহা তাঁহার শিল্পের উপাদান, আর পাথর রঞ্জনদ্রব্য শব্দ প্রভৃতি যে-সকল বস্তুর সাহায্যে তিনি ভাবকে রূপায়িত করেন তাহা শিল্পের উপকরণ। যাঁহারা শিল্পের উপকরণের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহারা দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের রচনাবলী পড়িয়া দেখিতে পারেন।

সাহিত্যিকের উপকরণও শব্দ, কিন্তু সংগীতরচয়িতার মতো তিনি শুধু শব্দ লইয়া কারবার করেন না। তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করেন সেই শব্দ অর্থ-সমন্বিত এবং প্রধানত অর্থের মাধ্যমেই কবি রসের সঞ্চার করেন। সুতরাং সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই শব্দ ও অর্থের সহিতত্বের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক শব্দেরই একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই শব্দটি উচ্চারিত হইলেই সেই অর্থটি বোঝা যায়। গোরু বলিতে একটি বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুকে নির্দেশ করা হয়। এই জাতীয় অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় এবং ইহার নাম অভিধা বা মুখ্য অর্থ। প্রত্যেক শব্দেরই একটি সংকেত বা নিয়ম আছে এবং তাহার দ্বারাই এই অর্থ— ইহাই শব্দের মুখ্য অর্থ— নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু শুধু এই অভিধা বা মুখ্য অর্থের দ্বারা পদের অর্থ পাওয়া যায়, বাক্যের নহে। এক পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সমগ্র বাক্যের অর্থ পাওয়া যায়। 'এখানে গোরুটি আন'— এই বাক্যে শুধু প্রত্যেকটি পদের অর্থ লইয়াই কাজ চলে না, প্রত্যেকটি শব্দ অপর শব্দের সঙ্গে অন্বিত হইয়া বাক্যের তাৎপর্য রচনা করে। কোনো কোনো শব্দের একাধিক মুখ্য অর্থ থাকে ; তাহার মধ্যে কোন্‌টি কোথায় প্রযোজ্য হইবে, কোথায় 'মৃগ'-শব্দের দ্বারা হরিণকে বুঝাইবে, কোথায় যে-কোনো পশুকে বুঝাইবে, তাহা অন্য শব্দের সঙ্গে অন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে। এই জন্য কেহ কেহ শব্দের এক বিশেষ শক্তির পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার নাম তাৎপর্যবৃত্তি।

শব্দ অন্বিত হইয়াই নিজের অর্থের ঘোষণা করুক, অথবা তাৎপর্য-বৃত্তির সাহায্যে করুক, এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে শব্দের সুচিরপরিচিত, নির্দিষ্ট, সংকেতিত অর্থ বাধা প্রাপ্ত হয়। আমি অবজ্ঞাভরে বলিতে পারি, সে একটি গোরু, অথবা প্রশংসাভরে বলিতে

পারি, সে একজন পুরুষসিংহ। এখানে 'গোরু' বা 'সিংহ'-শব্দের মুখ্য অর্থ প্রযোজ্য নহে। অনেকে চা খাইতেছে, আমি বলিলাম; আমিও এক কাপ খাইব! আমি কাপটিকে খাইব না, কাপে যে চা দেওয়া হইবে তাহাই পান করিব। কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত শব্দের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। শেক্সপীয়রের নাটকে অ্যাণ্টনী বারংবার ব্রুটাসকে '**honourable**' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে ব্রুটাস সত্যনিষ্ঠ বা বহুমানাস্পদ নহেন। অভিধা ও তাৎপর্যের দ্বারা এই-সব প্রয়োগের ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং শব্দের একটি তৃতীয় শক্তির কল্পনা করা যাইতে পারে। ইহার নাম লক্ষণা। যেখানে মুখ্য অর্থের প্রয়োগে বাধা থাকে এবং সেইজন্য মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি অর্থের কল্পনা করার প্রয়োজন হয় তাহাই লক্ষণার ক্ষেত্র।

২

উপরে যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লিখিত হইল তাহাদের সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। 'আমাকে এক কাপ (চা) দাও'— এই বাক্যে কোনো কাব্যসৌন্দর্য নাই। শুধু 'কাপ' বলিতে 'চা' বুঝিতে হইবে— এই পর্যন্ত। 'গোরু' বলিতে 'মূর্খতা' বা 'সিংহ' বলিতে 'তেজস্বিতা' বোঝানোও এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহা বলিবার একটি ভঙ্গি (বক্রোক্তি) মাত্র। কিন্তু অ্যাণ্টনী যে বারংবার ব্রুটাসকে **honourable** বলিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি ব্রুটাসকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তাহার মনের ভাব এই বিপরীত লক্ষণার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে; অন্য কোনো শব্দের সরল সহজ অভিহিত অর্থের দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু এই-যে একটি শব্দের দ্বারা তাহার প্রচলিত মুখ্য অর্থের অতিরিক্ত আর-একটি অর্থ

বোঝানো যায় তাহার জন্য মুখ্য অর্থের বাধার কোনো প্রয়োজন অনেক সময় থাকে না।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

বর্ষায় গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে, ভরানদীর খরস্রোত পার হওয়া দুরূহ ব্যাপার, বক্তা ধান কাটিয়া কূলে একা বসিয়া আছেন। পঙ্‌ক্তিগুলির ইহাই সরল অর্থ। ইহাকে বাচ্য অর্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইখানেই কবিতাটির অর্থ পরিসমাপ্ত হইয়া যায় নাই। এই বাচ্য অর্থকে অতিক্রম করিয়া আর-একটি অর্থ ধ্বনিত হইতেছে; কবি তাঁহার অপেক্ষমাণ হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং কবি-বর্ণিত বক্তা সেই আকুলতার বিভাব মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শব্দের একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা সে প্রাথমিক বাচ্য অর্থ ছাড়াও অপর একটি অর্থের দ্যোতনা করিতে পারে। এই অর্থের নাম ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি, এবং এই শক্তির নাম ব্যঞ্জনা-শক্তি। ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য লাভ করিলেও বাচ্য অর্থ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয় না এবং বাচ্যই ব্যঙ্গ্যের ভিত্তিভূমি। বাচ্য অর্থ দৈনন্দিন ব্যাপারে, শাস্ত্র ইতিহাসাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর তাহাকে ভিত্তি করিয়াই ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনিত হইয়া থাকে এবং সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ বা ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। যিনি আলোক চাহেন তিনি দীপ জ্বালাইয়াই আলোক পাইবেন; সুতরাং তাঁহাকে দীপশিখার প্রতি যত্নবান্ হইতে হইবে। সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের আস্বাদ করিতে হইলে বাচ্য অর্থের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। প্রদীপের আলোক যেমন

নিজেকে প্রকাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; পরন্তু চারি পাশে অপর বস্তুকেও উদ্ভাসিত করে, তেমনি ব্যঙ্গ্য অর্থ শুধু নিজেকেই ধ্বনিত করে না বাচ্য বস্তুর উপরও আলোকসম্পাত করে। পদের অর্থের দ্বারাই বাক্যের অর্থ নিষ্পন্ন হয়। বাক্যের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে যেমন বিভিন্ন পদের অর্থ দূরীভূত হয় না সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আক্ষিপ্ত করিলেও বাচ্য অর্থ নিজেকে লুপ্ত করিয়া দেয় না। কটক-কেয়ূরাদি অলংকার রমণীদেহের শোভা বর্ধন করে। কিন্তু অলংকার বাহিরের বস্তু, তাহা ইচ্ছামত গ্রহণ করা যায় এবং ইচ্ছামত ত্যাগ করা যায়। রূপসী রমণীর আসল সৌন্দর্য নির্ভর করে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের উপর; সেই অঙ্গসৌষ্ঠব কিন্তু আপনাতেই আপনি সীমাবদ্ধ থাকে না; তিল-ফুলনাসিকা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠ ও চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ হইতেই লাবণ্য আক্ষিপ্ত হয়। লাবণ্যের ভিত্তিভূমি অঙ্গসৌষ্ঠব, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠব লাবণ্যের উপায় মাত্র এবং লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাকে অপ্রধান বলিয়াই মনে হইবে।

বাচ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যের, তথা ইতিহাস ও শাস্ত্রাদির সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক প্রাচীন আলংকারিকগণ কয়েকটি উপমার সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ যথাসময়ে করা হইবে। এইখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিই রসের উপযুক্ত বাহন। রস অ-লৌকিক বস্তু। পার্থিব জীবনে যে-সব শব্দের দ্বারা ভাব প্রকাশ করি, ঠিক সেই সেই শব্দের দ্বারা রসের প্রতীতি হইতে পারে না অর্থাৎ রস স্ব-শব্দনিবেদিত হইতে পারে না; 'ভালোবাসা'-শব্দের দ্বারা ভালোবাসার কাব্য রচিত হইতে পারে না; 'ভালোবাসা'-শব্দটি থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করিবে অন্যান্য শব্দের উপর। সেই-সকল শব্দেরও প্রচলিত মুখ্য অর্থগ্রহণ করিলে চলিবে না, কারণ যে অর্থ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা

অ-লৌকিকের আস্বাদ আনয়ন করিতে পারিবে না। যখন শব্দ লৌকিক জীবনের সংকেত বা নিয়ম অতিক্রম করিয়া অ-লৌকিকের ইঙ্গিত দিতে পারে তখনি কাব্যের সৃষ্টি হয়। এই দ্যোতনা ধ্বনিত অর্থের দ্বারাই প্রাপণীয়। এই ধ্বনিত অর্থের কাছে বাচ্য অর্থ গৌণ, কিন্তু তাহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। রসের আস্বাদ সরবৎ বা পানক রসের আস্বাদের ন্যায়; নানাবস্তুর মিশ্রণে পানকরস প্রস্তুত হয়, পান-রসিক সেই মিশ্রিত বস্তুর সমস্ত উপাদানের আস্বাদ পাইয়া থাকেন এবং পানীয়ের সমগ্রতাও উপলব্ধি করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ব্যঞ্জনা বাক্যের তাৎপর্য মাত্র নহে, ইহা লক্ষণাও নহে; তবে ইহা কি শ্লেষ? শ্লেষাত্মক বাক্যের শব্দে দুইটি করিয়া অর্থ থাকে এবং দুইটি অর্থের প্রয়োগ করিয়াই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন:

ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥···
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥···

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি শ্লেষের নিদর্শন, ব্যঞ্জনার নহে, কারণ এইখানে শব্দের একটি অর্থ নিজেকে প্রকাশ করিয়া অপর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে না। বরং একই শব্দ দুইটি পরস্পর-অসম্পৃক্ত অর্থ অভিহিত করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে এইখানে আমরা দুইটি শব্দ পাইতেছি। তাহাদের বাহিরের রূপের ঐক্য আকস্মিক; প্রকৃতপক্ষে তাহারা বিভিন্ন। ভগবতী অন্নপূর্ণা আর ঈশ্বরীপাটুনি বিভিন্ন ব্যক্তি; 'ঈশ্বরী' শব্দ দুই জায়গায় পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ইহাদিগকে পৃথক শব্দ হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। 'সিদ্ধি' 'গুণ' 'আগুন' সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে তুলনা করা

যাইতে পারে :

অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজৃম্ভত গ্রীষ্মাভিধানঃ
ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাস্যো মহাকালঃ।

'এমন সময় কুসুমসময়যুগ সমাপন করিয়া গ্রীষ্মনামা মহাকাল বিকশিত হইল, তাহার অট্টহাস্য প্রস্ফুটিত মল্লিকার মতো শুভ্র।'

এখানে বসন্তের পর গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া সংহারের দেবতা মহাকালাখ্য শিবের অভ্যাগমও সূচিত হইয়াছে এবং এই সূচনার একটি সার্থকতা এই যে, কালের অধীশ্বরের পদক্ষেপ কালের সঞ্চরণের মধ্য দিয়াই ধ্বনিত হয়। তবু এখানেও 'কাল' ও 'মহাকাল'-শব্দদ্বয়ের মধ্যে শ্লেষের আভাস আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনার উদাহরণ :

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

'দেবর্ষি নারদ পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পার্বতী পিতার পাশে বসিয়া লীলাকমলের পত্রগণনা করিতে লাগিলেন।'

এই বাক্যের বাচ্য অর্থ সহজভাবে গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা হইতে অপর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতেছে— তাহা হইল বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার সলজ্জ পুলক। অথবা

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

এই কবিতার বাচ্য অর্থ এই যে, বসন্তরজনীতে কবি তাঁহার প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন এবং প্রণয়িনীর প্রসাধন ও সাজসজ্জার বর্ণনাও দিয়াছেন। এই প্রণয়িনী বাস্তবজগতের প্রণয়িনী নহেন— পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়া। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ অসম্ভাব্য ব্যাপার; যদি কেহ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তাহা ক্ষণিক কৌতুকের বিষয়, ইহার কোনো সারবত্তা নাই। কিন্তু কবি প্রণয়িনীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সৌন্দর্য ধ্বনিত হইয়াছে এবং সেই কারণে এই অভিসার সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অ-লৌকিক রসের আস্বাদ দান করিতে পারিয়াছে। স্বপ্নটি কবির, কিন্তু যে-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যে-কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারেন। 'মেঘদূত' প্রভৃতি কাব্য হইতে কবি যেভাবে শব্দচয়ন করিয়াছেন তাহার জন্য প্রিয়ার বর্ণনার বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যময় রূপ আভাসিত হইয়াছে।

উপরি-উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যঞ্জনার দ্বারাই হৃদয়স্থিত ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এই অভিব্যক্তি সহজ বাচ্য অর্থের দ্বারা সম্ভব হইত না। ভারতচন্দ্র শ্লেষের সাহায্যে দেবী অন্নপূর্ণার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বৈদগ্ধ্য বুদ্ধির নৈপুণ্য জ্ঞাপন করে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে, অন্তত এই ক্ষেত্রে নাই। ইহার সঙ্গে যদি রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার তুলনা করি তাহা হইলে বক্রোক্তিপূর্ণ কাব্য ও রসসমৃদ্ধ

কাব্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারি। রসের প্রতীতি ব্যঞ্জনা-সাপেক্ষ, কারণ শব্দ যখন ব্যবহারিক জগতের ঊর্ধ্বে নূতন অর্থের দ্যোতনা করে, তখনি তাহা লৌকিক ভাবকে অ-লৌকিক রসে রূপান্তরিত করিতে পারে। শুধু ধ্বনি থাকিলেই রস হয় না; যখন ইহা অনুভূতির দ্বারা সঞ্জীবিত হয় তখনি রসপ্রতীতি সম্ভব হয়। আমি কোনো ব্যক্তির কোনো জায়গায় যাওয়া পছন্দ করি না, কিন্তু তাহাকে বলিলাম, 'বেশ, তুমি যাও।' এইখানে যদিও আমি তাহাকে যাওয়ার অনুমতি দিতেছি, তবু প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাকে নিষেধ করিতেছি। এইখানে ধ্বনি আছে, কিন্তু রস নাই। ইহার সঙ্গে তুলনা করি:

ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোহদ্যমারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতা গহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

'হে ধার্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই কুকুর গোদাবরী-তীরস্থিত লতাকুঞ্জবাসী দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।'

যে ভীরু সন্ন্যাসী কুকুরের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, সে সিংহের নাম শুনিলে আর কখনো ওইদিকে যাইবে না। সুতরাং বক্ত্রী নায়িকা ভ্রমণ নিষেধ করিবার জন্যই এই কথা বলিতেছে। এই বক্রোক্তির মধ্য দিয়া তাহার সলজ্জ গোপন প্রেম অভিব্যক্তি পাইয়াছে। গোদাবরী-তীরস্থিত লতাগহনে এই নায়িকা তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হইত এবং পুষ্পলাবী সন্ন্যাসীর আগমনে লতাকুঞ্জের গোপনতা নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং সে সন্ন্যাসীকে নিষেধই করিতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিতেও সাহস পায় না। তাহার এই মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই এই বক্রোক্তি রসনিঃস্যন্দী হইয়াছে অর্থাৎ কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে।

৩

রস ও তাহার উপায়ভূত ধ্বনির দ্বারা কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহার সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন সহজেই জাগ্রত হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই : এই জাতীয় বিশ্লেষণ একটি শ্লোক বা একটি খণ্ডকবিতার রস আবিষ্কারের সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু কোনো কাব্যের সমগ্র রূপ কি ইহাতে ধরা পড়ে ? ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন, 'সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ কুমার-সম্ভব শকুন্তলা উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল ? প্রত্যেকটি শব্দ নির্বাচন, প্রত্যেকটি রেখার টান, বর্ণানুরঞ্জনের সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে একটি কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায় ?'

আনন্দবর্ধন উল্লিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে যে একেবারে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে। 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে তিনি বলিয়াছেন যে কাব্যপ্রবন্ধে এক অঙ্গিরস নিবদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যান্য যাহা কিছু থাকে তাহা ওই অঙ্গিরসের পোষকতা করে মাত্র। রামায়ণে করুণরস প্রাধান্য পাইয়াছে। মহাভারতে কাহিনীর অবধি নাই, কিন্তু 'কাব্যশোভাশালী মহাভারতেও মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসার-বিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ এবং শান্তরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়··· পাণ্ডবাদির চরিত্র বর্ণনারও তাৎপর্য এই যে, তাহা বৈরাগ্য জন্মায় ও বৈরাগ্যমূলক, এবং গীতাদিতে দেখানো হইয়াছে যে, মোক্ষ প্রধানত ভগবানকে

পাইবার উপায়।' শকুন্তলার প্রথম দিকে দেখিতে পাই রাজা দুষ্মন্তকে দেখিয়া আশ্রমমৃগ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে। কালিদাস ভয়ের যে অপরূপ বর্ণনা দিয়াছেন সেই সম্পর্কে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ভয়ানক রসের এই উদাহরণের সঙ্গে সমগ্র নাটকটির সম্পর্ক কোথায়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নাটকে রতিভাবের যে রূপটি প্রকাশ পাইতেছে, আশ্রমপালিত মৃগশিশুর ভয়ার্ততা তাহার সঙ্গে অসম্পৃক্ত নহে।

কিন্তু এই উত্তরে আসল প্রশ্নটির সম্যক সমাধান হইল না। ভরতমুনি রসের যে সূত্র দিয়াছেন তাহাতে সামগ্রিক ভাবের উল্লেখ নাই। রস নিষ্পন্ন হয় বিভাব ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের মাধ্যমে। ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের মধ্য দিয়াই আমরা বিভাবকে জানি। সুতরাং কাব্য ও সাহিত্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ব্যভিচারী ভাব, অনুভাব ও উদ্দীপন বিভাবেরই বর্ণনা দেয়; ইহাদের বৈচিত্র্যই কাব্যের বৈচিত্র্য। সুতরাং প্রশ্ন রহিয়া গেল, রসকে অঙ্গিভাবে দেখিয়া লাভ কি এবং কোনো-একটি শ্লোকের ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণের দ্বারা অঙ্গিরস প্রতীতির কি সুবিধা হইবে? আরো একটি মৌলিক আপত্তি খণ্ডন করিতে হইবে। শৃঙ্গাররস বহু কাব্য ও নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তারতম্য করিব কেমন করিয়া? প্রাচীন আলংকারিকেরা আটটি বা নয়টি প্রধান ভাব মানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব যোগ করিয়া নানা বৈচিত্র্যের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে কাব্যের বিভাগ করিয়াছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটির বেশি হইতে পারে। তেত্রিশই হউক আর বেশিই হউক ইহাদের সঙ্গে আট বা নয়টি স্থায়ী ভাব সন্নিবিষ্ট করিলে লোষ্ট্রপ্রস্তারন্যায় (permutation and combination) প্রয়োগ করিয়া কাব্যের বহু বিভাগ ও উপ-বিভাগ রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে আলোচনা করিলে শুধু বিষয়বস্তুরই নির্দেশ

দেওয়া হইবে— ইহা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার, ইহা সম্ভোগশৃঙ্গার, এবং এই দুইপ্রকারেরও ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবাদির সংযোগে আরো অনেকগুলি বিভাগ উপ-বিভাগের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের নূতন নূতন নাম দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় বিশ্লেষণ নামকরণে পর্যবসিত হইবে মাত্র, ইহার দ্বারা রসবিচার সম্ভব হইবে না। মনে হয় প্রাচীন আলংকারিকগণ রসকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তুহিসাবে পরিকল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহারা শুধু রসের বিষয়বস্তুরই বিবরণ দিতে পারিয়াছেন, কাব্যসৌন্দর্যের অন্তরলোকে পৌঁছাইতে পারেন নাই।

রস ছাড়িয়া রসপ্রতীতির উপায়ের আলোচনা করিলেও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে হইবে। শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে কি না ইহা লইয়া যে তর্ক আছে বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শব্দের ও অর্থের প্রকারভেদে নানারূপ ধ্বনির সৃষ্টি হইতে পারে; আলংকারিকেরা তাহাদের নানারূপ নামও দিয়াছেন— অবিবক্ষিতবাচ্য, বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য, সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য, শব্দশক্তিমূলক, অর্থ-শক্তিমূলক ইত্যাদি। একটি ধ্বনিতে বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হইয়াছে অথবা হয় নাই, একটি ধ্বনির মূল শব্দ, আর-একটি ধ্বনির মূল অর্থ। এই জাতীয় বিষয়-বিভাগের দ্বারা নামকরণ সহজ কিন্তু ইহার দ্বারা রসের স্বরূপ বা কাব্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে এবং ইহার দ্বারা প্রকৃত কাব্য বিচারও করা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় বিশ্লেষণ করিলে ধ্বনির শ্রেণীও অনন্ত হইয়া পড়ে। শ্রেণীবিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আলংকারিকেরা শ্রেণীর অনন্ততার সম্মুখীন হইয়াছেন। অভিনবগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, এক অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য নামক ধ্বনিরই অনন্ত প্রকার হইতে পারে। অন্যান্য দুই-একটি প্রকারের তিনি যে ভাবে

বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাও অনন্ততায় যাইয়া পৌছায়। রসের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আনন্দবর্ধন এই জাতীয় বিশ্লেষণের ব্যর্থতার কথাই স্বীকার করিয়াছেন: 'এইভাবে কোনো একটি রসকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলেই পরিমাপ করিয়া দেখা যায় না, তাহার অঙ্গভেদ পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি ? সেই-সকল অঙ্গপ্রভেদের প্রত্যেকটির যদি অঙ্গিপ্রভেদের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহারা অনন্ত হইবে।' অথচ আনন্দবর্ধন প্রভৃতি রসের ও ব্যঞ্জনার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহাদের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই অনন্তপ্রভেদের পরিকল্পনা ও বর্ণনা। যে শাস্ত্র রসের তারতম্যবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের মধ্যেই পর্যবসিত হইবে এবং এই অনন্ত নামকরণের মধ্য দিয়া নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব

সাহিত্যের সংজ্ঞা

ভরতমুনি রসের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়।' ভাব থাকে কবি বা সহৃদয়ের হৃদয়ে, কাব্যবর্ণিত নায়ক-নায়িকা আলম্বনবিভাব, যে-সমস্ত বস্তুর দ্বারা ভাব উদ্দীপিত হয় তাহারা উদ্দীপনবিভাব, ইহাদের অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ভাব রসে রূপান্তরিত হয়। এই মতানুসারে ভাব ও রসের স্বতন্ত্র নিজস্ব অস্তিত্ব পরিকল্পনা করা হয়; যে-সব চরিত্র সৃষ্টি করা হয় তাহাদিগকে রসের প্রতীতির বা ভাবের রূপান্তরণের উপায় হিসাবে পরিগণিত করা হয়। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা রতিভাবের আলম্বন বিভাব এবং চন্দ্রালোক উদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। অর্থাৎ রসপ্রতীতিব্যাপারে ইহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত; ইহাদের পার্থক্য গৌণ, ইহারা এক জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি। ইহাদের একই কাজ—রসকে আক্ষিপ্ত করা।

এইখানেই রসবাদের মৌলিক ত্রুটি নিহিত রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে রসের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই এবং যে-সকল নরনারী সাহিত্যে সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারা রসের আধার মাত্র নহে। তাহারা কবির ভাবের দ্যোতক এবং সেই ভাব দেশকাল-অনালিঙ্গিত, কিন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে ভাব রূপগ্রহণ করে চরিত্রে; এমন-কি, নিসর্গ-বর্ণনার মধ্য দিয়াও কবির চরিত্রই ফুটিয়া উঠে। লিওনার্দো দাভিঞ্চির অঙ্কিত জগদ্বিখ্যাত চিত্র মোনালিসারই চিত্র। মোনালিসার মধ্য দিয়া যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবই চিত্রটিকে উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না। যে রমণী এই চিত্রের মডেল

তিনি চিত্রে গৌণ হইয়া গিয়াছেন, তাহাও মানিতে হইবে। বাস্তব-জীবনে এই রমণীর যে গুণাগুণ ছিল তাহা চিত্রে ধরা নাও পড়িতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, চিত্রার্পিত মোনালিসা সম্পূর্ণ সজীব রমণী। তাহার প্রাণশক্তি হইতেই রস বিচ্ছুরিত হইয়াছে এবং তাহাকে রসের আধার মাত্র মনে করিবার কারণ নাই। অভিনব-গুপ্ত বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন যে বিভাবই রস, এবং তাঁহার যুক্তিভঙ্গি হইতে মনে হয় যে রসের অ-লৌকিকত্ব ও প্রাধান্য মানিয়া লইলে তিনি এই মত দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। আমাদের বক্তব্য এই যে, শিল্পকাব্যবর্ণিত নায়ক-নায়িকারা কোনো রসের বিভাবমাত্র নহে, তাহারাই প্রধান এবং কাব্যসৌন্দর্য তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে। প্রাচীন আলংকারিকদের ভঙ্গিতে বলা যাইতে পারে যে এখানে ক্রম অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে সাহিত্যে অঙ্কিত চরিত্র প্রতিভাত হইবে এবং তার পর মনে হইবে সেই চরিত্রের মধ্য দিয়া কোন্ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে বা কোন্ রসের প্রতীতি হইতেছে। সাহিত্যবর্ণিত ভাব এবং অঙ্কিত চরিত্র— ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না এবং যে ক্রমের কথা বলা হইল তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অসংলক্ষিত থাকে। তবু এই ক্রম আছে এবং ইহাকে সোজাসুজিভাবে দেখেন নাই বলিয়া রসবাদীরা নানা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

সাহিত্যের প্রধান কাজ চরিত্রসৃষ্টি। মহাকাব্য নাটক ও গল্পের তো কথাই নাই। গীতিকবিতার মধ্য দিয়াও গীতিকবির মনের কথা প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বই সেখানে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। সাহিত্যের আবেদন সার্বজনীন, কিন্তু তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নহে। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন, 'অপার কাব্যসংস্কারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা। যেমন ইহার অভিরুচি, বিশ্ব সেইভাবে পরিবর্তিত হয়।' কবির সঙ্গে প্রজাপতির গভীরতর সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন

জীবন্ত নরনারী সৃষ্টি করিতে পারেন কবিও সেইরূপ সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণসত্তাসমন্বিত চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন। সেইজন্যই কবি স্রষ্টা। প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যেমন দেখিতে পাই যে, কোনো নর বা নারী অন্য কোনো নর বা নারীর মতো নহে, প্রত্যেকেই স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, সাহিত্যের সৃষ্টির মধ্যেও সেই স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। বস্তুত কবির সৃষ্টি ও প্রজাপতির সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, কেহ কেহ মনে করেন যে কবি বাস্তবজীবনের চরিত্রের অনুকরণ করেন। কেহ কেহ এইজন্য কবিকে নিন্দা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ বাস্তবানুগামিতাকে কাব্য ও সাহিত্যের বিচারের মাপকাঠি করিয়াছেন। এই উভয় মতই ভ্রান্ত। কবির সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ বাস্তবানুগামিতা বা বাস্তবাতিরেক নহে; ইহার প্রধান লক্ষণ মৌলিকতা। তিনি কাহারো অনুকরণ করেন না। শিল্প কোনো কোনো বিষয়ে বাস্তবসদৃশ, আবার বাস্তবও কোনো কোনো বিষয়ে শিল্পসদৃশ। হ্যাম্‌লেট আমাদের মতো, না, আমরা হ্যাম্‌লেটের মতো? একটি কথা স্মরণ রাখিলেই অনুকরণবাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইবে। কোনো একটি বিশেষ লোক বা বিশেষ ঘটনার অনুকরণ করিলে, সাহিত্য সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িত, তাহা দেশকাল-নিরপেক্ষ হইত না। যদি বলা যায় যে, সাহিত্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে অনুকরণ করে না, কোনো সার্বজনীন ভাব বা ধর্মের অনুকরণ করে, তাহা হইলে সেই যুক্তিও টিঁকিবে না, কারণ সেই সার্বজনীন ভাব বা ধর্ম তো কোনো ব্যক্তিতে বা বস্তুতে থাকে না, তাহা কবির কল্পনা। বাস্তবজীবনে শেক্সপীয়র কোনো সন্দিগ্ধচেতাঃ স্বামীকে দেখিয়া ওথেলো নাটক রচনায় উদ্‌বোধিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু ওথেলোর মধ্যে সন্দেহপরায়ণতায় যে পরিচয় পাই, তাহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের অনুকৃতি নহে। যদি বলা যায় যে ইহা সন্দেহপরায়ণতা নামক ব্যভিচারী ভাব বা রতিভাবেরই প্রকারভেদের চিত্র তাহা

হইলেও ভুল করা হইবে, কারণ ঐ শ্রেণীতে আরো বহুলোকের বা বহুকাহিনীর কল্পনা করা যাইতে পারে যাহাদের সঙ্গে ওথেলোর চরিত্রের বা কাহিনীর কোনো সাদৃশ্য নাই। ওথেলো নাটক ওথেলো ইয়াগো ডেসডিমোনা প্রভৃতির কাহিনী। ঐ নাটকের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ঐখানে তাহারা সজীব এবং আপন আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

২

এখন প্রশ্ন এই: কবির সৃষ্টি ও প্রজাপতির সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈষম্য কোথায়? মানবজীবন সম্পর্কে একটু অনুধাবন করিলেই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। জীবন্ত বস্তুর প্রধান গুণ বিবর্তনশীলতা। বিরাট যুদ্ধজাহাজ বা কলকারখানার অতিকায় যন্ত্র— ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমষ্টিমাত্র, ছোটো হইতে আপনা-আপনি বড়ো হয় নাই। প্রাণবান জীব ভ্রূণ হইতে ধীরে ধীরে আপনার প্রাণ-শক্তির বলে পরিণতি লাভ করিয়া চলিতেছে, মুহূর্তের জন্য কোথাও থামিয়া থাকে না। সাত মাসের শিশু, সাত বছরের বালক, সতেরো বছরের যুবক, সাতচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় এবং সাতাশি বছরের বৃদ্ধ— ইহাদের ফোটোগ্রাফ দেখিলে মনে হইবে না যে ইহারা একই ব্যক্তি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে সাত মাসের শিশুই, প্রধানত আপনার লীলাচঞ্চল প্রাণশক্তির প্রেরণায়, সাতাশি বছরের বৃদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহার একক ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনে অনেক অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সে বহু স্ববিরোধী কাজ করিয়াছে বা অসংলগ্ন কথা বলিয়াছে কিন্তু তবু মনে হয় যে তাহার বিচিত্র কাজ ও অভিজ্ঞতা তাহার অখণ্ড ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিত্বের দ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে।

ইহার উত্তরে বলা হইবে যে, উদ্ভিদেরও তো এই জাতীয় বিবর্তন আছে। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ছোটো গাছ এবং ছোটো গাছ হইতে বিরাট মহীরুহে পরিণতি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাইয়া থাকি এবং যে-কোনো উদ্ভিদ্ আপনার শক্তির দ্বারাই মাটি হইতে রস টানিয়া লইয়া শির উত্তোলন করে। ইহার পরিণতির মধ্যেও ঐক্যের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু কেহ বলিবেন না যে এই ঐক্য ব্যক্তিত্বের ঐক্য অথবা উদ্ভিদের মধ্যে সেই প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা মানব-জীবনের বৈশিষ্ট্য।

প্রাণশক্তির অন্যতর প্রধান লক্ষণ তাহার লীলাচঞ্চলতা বা স্বাধীনতা। নীহারিকাচক্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের ঘরের বিজলীবাতি পর্যন্ত জড়জগতের যে-কোনো বস্তু যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের কাহারো মধ্যে স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যায় না। প্রাণিজগতে এই স্বাধীনতার সূচনা দেখা যায়, কিন্তু ইহার পূর্ণ বিকাশ পাওয়া যায় নরনারীর চরিত্রে। যদি জড়জগতের নিয়ম ঠিকমত জানা যায় তাহা হইলে গ্রহনক্ষত্রের গতিও ঠিকমত বলা যায়; তাই কবে অমাবস্যা, কবে পূর্ণিমা, কবে গ্রহণ, এই বিষয়ে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সব সময়েই অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভূমিকম্প কখন হইবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য। অথচ আমার নিকটতম বন্ধুর মনোভাব যে আমি সম্পূর্ণভাবে জানি না তাহার কারণ আমার জ্ঞানের অভাব নহে, তাহার প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি তাহাকে কোন্ পথে ঠেলিবে তাহার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই; সে নিজেই তাহার মনের কথা বলিতে পারিবে না। আজকালকার দিনে সাম্যবাদের প্রচারের ফলে একটা কথা খুব বেশি করিয়া বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে

সাহিত্য-শিল্প-দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই মত যথার্থ নহে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাহার ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বাহিরের শক্তির প্রভাবের মধ্যে নহে, স্বীয় অপ্রতিরোধনীয় লীলাচপলতায়। প্রাণশক্তির গতি অপ্রত্যাশিত বলিয়াই তাহা রহস্যময়ও। জড়জগতে অনেক কিছু আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের এই অটুট বিশ্বাস আছে যে ইহার সব-কিছুই জ্ঞেয়। আমি যে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছি, তাহার স্বল্পাংশই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু বাকি অংশ সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত ধারণা আছে এবং প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলাইয়া সেই ধারণা যাচাই করিতে পারি। কিন্তু সজীব মানুষ সম্পর্কে এইরূপ নিশ্চিত প্রত্যাশা করা যায় না। তাহার বিচ্ছিন্ন কার্য ও বাক্যের মধ্য দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, কিন্তু তবু মনে হয় এই বিচ্ছিন্ন কার্য ও বাক্য একত্র করিলেও সেই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না, তাহার রহস্যময়তা তিরোহিত হইবে না।

সাহিত্যে যে চরিত্রসৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে সজীবতার এই লক্ষণগুলি বর্তমান। সাহিত্যের চরিত্রগুলি ক্রমবর্ধমান। ছোটো নাটকে বা গল্পে ক্রমবর্ধমানতা সুপরিস্ফুট নহে, কিন্তু তবু গল্প বা নাটকের শেষে —এমন-কি, গ্রীক নাটকে যেখানে স্থান ও কালের পরিবর্তন নাই— আমরা এমন দুই-একটি লক্ষণের পরিচয় পাই যাহার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই-যে অপ্রত্যাশিত উদ্‌ঘাটন— ইহা শুধু বিবর্তনশীলতার পরিচয় দেয় না রহস্যময়তারও ইঙ্গিত দেয়। কে মনে করিতে পারে যে, নিতান্ত তুচ্ছ কাল্পনিক কারণে লেডি ম্যাকবেথের মতো দৃঢ়চিত্ত হিংস্র রমণী ঘুমন্ত ডান্‌কানকে হত্যা করার মতো সহজ কাজ করিয়া উঠিতে পারিবে না? নাটকের শেষের দিকে এই রহস্যময়ী রমণীর যে পরিণতি দেখিতে পাই তাহা অসম্ভাব্য না হইলেও অপ্রত্যাশিত। সাধারণত

গীতিকবিতায় বা ছোটোগল্পে চরিত্রের রহস্যময়তার উপর জোর দেওয়া হয় আর মহাকাব্যে বা উপন্যাসে চরিত্রের জটিল পরিণতি চিত্রিত হয়। আর এই যে রহস্যময়তা বা বিবর্তনশীলতা— ইহা ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশের ফল, কবি কোনো বিশেষ মত প্রচার করিবার জন্য বা শিল্প-কলার কোনো বিশেষ নিয়মের খাতিরে ইহা চাপাইয়া দিতেছেন না। বার্ণার্ড শ প্রচারধর্মী সাহিত্যের জয়গান করিয়াছেন, নিজে কতকগুলি মত প্রচার করার জন্যই নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও সাহিত্যে অঙ্কিত চরিত্রের স্বাধীন গতিশীলতা মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি মত প্রকাশ করিবার জন্য তিনি কয়েকটি চরিত্রযোজনা করেন এবং তাহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইবে তাহারও ছক কাটিয়া দেন। কিন্তু খানিকটা পরেই দেখা যায় যে সৃষ্ট চরিত্রগুলি আপনাদের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং 'শ ছদ্ম দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, '—and then I have no more control over them than over my wife!'

সাহিত্যের চরিত্রগুলি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইলেও তাহাদের স্বাধীনতা অনেকটা সীমাবদ্ধ, কারণ তাহারা সাহিত্যস্রষ্টার অনুভূতির দ্বারা অনুরঞ্জিত এবং স্রষ্টার চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত। এক ইলেকট্রার কাহিনী লইয়া ইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস্ নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের অনুভূতি ও বুদ্ধির বৈষম্যের জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রস ও সাহিত্য অ-লৌকিক, লৌকিক জগতে যে-সব স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা দেখিতে পাই অ-লৌকিক জগতে তাহাই সম্ভাব্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং স্ববিরোধিতা তিরোহিত হইয়া যায়। শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন সঞ্চরণ-শীলতা সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রচুর অসম্ভাব্যতা

সত্ত্বেও আমরা এই-সব চরিত্র লইয়া এমনভাবে আলোচনা করি যেন তাহারা বাস্তবজগতে আমাদের অতিপরিচিত মিত্র বা শত্রু। কিন্তু তবু শেক্সপীয়র যে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে সুচতুর ইয়াগো তাহার স্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল হইবে কেন? ফল্স্টাফ যখন মহা আনন্দে জীবন যাপন করিতেছিল এবং অফুরন্ত আনন্দোৎসবের স্বপ্ন রচনা করিতেছিল তখন শেক্সপীয়রের কল্পনা তাহার চরম দুর্গতির পথ প্রস্তুত করিতেছিল। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণশীলতা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়, কিন্তু নাটকে নাট্যকার থাকেন আড়ালে; সুতরাং চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা, কারণ নাট্যকারের কল্পনার কাছে প্রারম্ভ ও পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা থাকে। এই কারণেই শ্রেষ্ঠ নাটকে irony বা বিপরীত লক্ষণার প্রয়োগ নাট্যকারের কলাকৌশলের পরিচয় দেয়। অনেক সময় নাট্য-উল্লিখিত চরিত্রেরা গূঢ় দ্যোতনাময় বাক্যে কথা বলে। তাহাদের উক্তিতে হেঁয়ালি নাই; যে প্রসঙ্গে যাহা বলিতেছে সেই প্রসঙ্গে তাহার অর্থ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই-সকল উক্তির মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ নিহিত আছে যাহা পাঠক বা দ্রষ্টা পরবর্তী কোনো প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিতে পারেন। কিন্তু নাট্য-কারের কল্পনা ইহার সন্ধান আগেই রাখিত, নচেৎ নাট্যকার বিপরীত লক্ষণার প্রয়োগ করিতে পারিতেন না।

৩

চরিত্রকে গৌণ করিয়া রসকে শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্র করিলে নানা বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আলংকারিকেরা আটটি বা নয়টি ভাবের ও রসের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে নানা টানাটানিতে

পড়িয়াছেন। তাঁহারা বাৎসল্যভাবকে রতির অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন; দানশীলতা ও ত্যাগের কাব্যকে বীররসের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং এইজন্যই নানা শ্রেণী ও উপশ্রেণীর কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে কাব্যের বিভাব হরিশ্চন্দ্র এবং যে কাব্যের বিভাব ভীম অথবা অর্জুন তাহারা মূলত বিভিন্ন; ইহাদিগকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহার অন্তর্গত উপশ্রেণী রচনা করিয়া লাভ কি? তৎপরিবর্তে যদি মনে করা যায় যে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রই কাব্যের মুখ্য বিষয় তাহা হইলে সে চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই প্রকৃত রসোপলব্ধি হইবে। আলংকারিকেরা রস ও ব্যঞ্জনার বিভাগ রচনা করিতে যাইয়া বেলা-ভূমিস্থিত অগণিত বালুকণার ন্যায় অসংখ্য শ্রেণীর কল্পনা করিয়া তাঁহাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতাই প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে প্রত্যেক কাব্য বা গল্প এক বা ততোধিক চরিত্রের বিকাশের ও রহস্য-উদ্‌ঘাটনের কাহিনী তাহা হইলে প্রত্যেক কাব্য বা গল্পই তাহার অনন্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; আমরা তাহার শ্রেণীগত ধর্ম অনুসারে তাহাকে কোনো এক কোঠায় ফেলিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না, তাহার ব্যক্তিগত রূপকে প্রত্যক্ষ করিব।

প্রাচীন আলংকারিকেরা ভাব বা রসের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে অনুভূতিকে বেশি প্রাধান্য দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা বুদ্ধিপ্রধান কাব্যের আলোচনার উপযোগী কোনো মানদণ্ড দিতে পারেন নাই। ভাবগুলির মধ্যে জুগুপ্সা নির্বেদ প্রভৃতি বুদ্ধির প্রভাব মুক্ত হইতে পারে না এবং আলংকারিকেরা শুধু যে কাব্যকে চতুর্বর্গ-লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই নহে, শাস্ত্র-ইতিহাসাদিকে কাব্যের ভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধি-দীপ্ত যে-কোনো সার্থক কাব্য বা নাটককে বিশ্লেষণ করিলেই ইহাদের মতের সংকীর্ণতা বোঝা যাইবে। বার্ণার্ড শ'য়ের প্রথম নাটক

Widower's Houses-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে একটি আদর্শবাদী যুবক এক রমণীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিছুদিন পরে সে জানিতে পারিল যে তাহার ভাবী শ্বশুর বস্তির মালিক এবং প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়াই সে অর্থোপার্জন করে। অমনি এই আদর্শবাদী যুবকের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। বস্তির মালিক তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে এই জাতীয় ব্যবসায় সকলেই লিপ্ত আছে: সুতরাং তাহার উন্নাসিকতা অর্থহীন। যুবকটির নিজের টাকা এবং তাহার অভিজাত আত্মীয়ার টাকা পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায়েই খাটানো হইতেছে। ইহাতে যুবকটির চোখ খুলিয়া গেল এবং সে তাহার প্রণয়িনীকে— অর্থাৎ বস্তির মালিকের কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। এই নাটকের অঙ্গিরস কি? শৃঙ্গার? বীভৎস? না শান্ত? বলা বাহুল্য ইহার কোনোটিই এখানে খাটিবে না। তার চেয়ে যদি মনে করি ঐ যুবক ও তাহার পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলিই কাব্যে প্রধান বস্তু এবং যুবকটিকে সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করানো কাব্যের বিষয় তাহা হইলে এই কাব্যের যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভব হইবে।

রামায়ণের পরিণতিতে করুণ রসের ও মহাভারতের পরিণতিতে শান্ত রসের প্রাবল্য দেখা যায় ইহা স্বীকার করিলেও এই দুইটি মহাকাব্যকে শুধু এই দুইটি রসের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিলে মধ্যবর্তী অনেক ব্যাপারের তাৎপর্যের প্রতি অবিচার করা হইবে। তার চেযে যদি মনে করা যায় যে রামায়ণ রাম্ লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের এবং মহাভারত কুরুপাণ্ডবদের চরিত্রের বিকাশের কাহিনী তাহা হইলে এই দুই মহাকাব্যের সত্যতর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাহিত্যবিচারে form বা আঙ্গিকের অথবা গঠনকৌশলের স্থান্ লইয়া বহু আলোচনা করা হইয়া থাকে। সাহিত্য সাহিত্যিকের মনের

ভাব ও ভাবনার অভিব্যক্তি এবং সেই ভাব ও ভাবনা চরিত্রের মধ্যেই রূপ পায়— এই কথা মানিয়া লইলে সাহিত্যে আঙ্গিকের স্থান নির্ণয় করা কঠিন হইবে না। প্রত্যেক চরিত্রই সজীব ও অনন্য এবং এই অনন্যতার জন্য প্রত্যেক কাব্যেরই একটি বিশিষ্ট গঠনরীতি থাকে। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সত্তা গঠনরীতির নিয়ামক হইবে; নাটকে কয়টি অঙ্ক থাকিবে মহাকাব্যে কয়টি সর্গ থাকিবে, একই নাটকে বা কাব্যে বহু রসের সংমিশ্রণ সম্ভব কি না এই সম্বন্ধে বাহির হইতে কোনো ঔচিত্যের নিয়ম চাপান যাইবে না। চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কেও এই স্বাধীনতা স্বীকার্য। মহাকাব্যের নায়ক ধীরোদাত্ত হইবে না ধীরোদ্ধত হইবে, শেক্সপীয়রের নায়কেরা অ্যারিস্টটলের সূত্রানুযায়ী কি না, ইব্‌সেনের নায়ক-নায়িকারা শেক্সপীয়রের নায়ক-নায়িকার আদর্শে রচিত কি না এই-সকল প্রশ্ন অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, যীশুখৃস্টের জীবনী বুথচাইল্ডের জীবনীর আদর্শে লিখিত হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি প্রত্যেক গল্প বা নাটকের চরিত্রানুসারে তাহার গঠনরূপ নিয়মিত হয় তাহা হইলে ট্র্যাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের কি কোনো সার্থকতা নাই এবং কাব্যের বা নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে কি কোনো নিয়ম রচনা করা যাইবে না? শ্রেণীবিভাগ অসার্থক নয় এবং আইনকানুন রচনাও সাহিত্যবিচারে সাহায্য করিবে। শুধু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল নিয়ম বা বিভাগ-উপবিভাগের কোনো চরম মূল্য নাই, ইহারা অলঙ্ঘনীয় নহে; প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টি আপন আঙ্গিক রচনা করে এবং সেইভাবেই তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব

সাহিত্য ও সত্য

রস অ-লৌকিক। কিন্তু রসের উপাদান লৌকিক জগৎ হইতে আহৃত হয়। বাস্তবজীবনের সঙ্গে অ-লৌকিক রসজগতের সম্পর্ক লইয়া স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রাচীন আলংকারিকেরা রসের অ-লৌকিকত্বে বিশ্বাসী হইলেও তাঁহারা লৌকিক জগতের সঙ্গে রসলোকের সংযোগের কথাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। লৌকিক ভাবই রসে রূপান্তরিত হয়, শাস্ত্র-ইতিহাসাদি কাব্যের ভিত্তিভূমি, বাচ্য অর্থই ব্যঙ্গ্য অর্থকে আক্ষিপ্ত করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের মত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই; বরং রসের অ-লৌকিকত্ব ও ধ্বনির বৈচিত্র্য প্রমাণ করিতেই তাঁহারা অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।

আধুনিককালে একশ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচকেরা বাস্তববোধকে খুব প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যের রূপ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর। এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহারা বাস্তবজীবনের মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের সম্ভাব্যতা বিচার করেন। বাস্তবজীবনে গনেরিল ও রিগ্যানের মতো মেয়ে থাকা সম্ভব কি না, বাস্তবজীবনে কোনো উত্তমর্ণ শাইলকের মতো সুদের পরিবর্তে ঋণীর দেহের অর্ধসের মাংস দাবি করিতে পারে কি না, সেই-সব তর্ক তুলিয়া তাঁহারা সাহিত্যের বিচার করিতে চাহেন। এই জাতীয় যুক্তি সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের হুবহু অনুকরণ সম্ভব কি না সেই বিষয়েই প্রথম সন্দেহ হইবে। যে জিনিস স্থির হইয়া বসিয়া থাকে তাহারই অনুকরণ সম্ভব, ফোটোগ্রাফার এক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ছবি তুলিয়া লন, কিন্তু সেই এক মুহূর্ত

আমাদিগকে স্থির হইয়া বসিতে হয়। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে, রস চিত্তবৃত্তিবিশেষ এবং চিত্তবৃত্তির প্রধান লক্ষণ তাহার প্রবাহধর্মিতা; যাহা স্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে শিল্পী কেমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবে? দ্বিতীয়ত, অনুকরণ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই প্রযোজ্য। কোনো একটি লোকের বা কোনো একটি ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া যদি বা সম্ভব হয়, তাহার মধ্যে পাঠকসমাজ কেমন করিয়া স্ব স্ব অনুভূতির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইবে? অ্যারিস্টটল্ বলিয়াছেন যে, ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষের অনুকরণ করে, কাব্যের অনুকরণের বিষয় সার্বজনীন সত্য। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সার্বজনীন সত্যের পরিচয় কাব্যে পাই তাহা কবির উপলব্ধির বস্তু, তাহা বাস্তব জীবনে কোনো একটি বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাইবে না। টেন ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং মার্কস্‌পন্থীরা[১] বলিবেন যে, সাহিত্যে ব্যক্তি গৌণ নহে, কিন্তু ইহা ব্যক্তির জীবনের আলোকের মধ্য দিয়া সমাজশক্তির খাঁটি রূপটি প্রতিফলিত করিবে। ব্যাল্‌জাক নিজে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিয়াছিলেন বলিয়া মার্কস্ তাঁহার রচনা খুব পছন্দ করিতেন। কিন্তু প্রশ্ন এই: সমাজব্যবস্থার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই যদি সাহিত্যবিচারে মাপকাঠি হয় তাহা হইলে সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য কোথায় থাকে এবং সাহিত্য ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রের পার্থক্য করিব কেমন করিয়া? দ্বিতীয়ত, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থনীতি ইতিহাসাদির যথার্থ বিচার করা হয় সেই জাতীয় প্রমাণ কি সাহিত্যেও প্রযোজ্য হইবে? তাহা যদি না বলা যায় তাহা হইলে ব্যালজাকের বর্ণনা যে যথার্থ বর্ণনা তাহা কেমন করিয়া বলিব? আর

১ টেন ও মার্কসবাদীদের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্যের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

যদি সেই নিরীখই মানা হয় তাহা হইলে সাহিত্যের সাহিত্যত্ব থাকে কোথায়? আর-একটি দিক হইতে বিচার করিলেও এই যুক্তির সারহীনতা প্রমাণিত হইবে। কোনো কোনো লেখক হয়তো ভালো বর্ণনা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ভালো সৃষ্টি নাও করিতে পারেন। রানী এলিজাবেথের সময়কার সমাজব্যবস্থার যে ছবি শেক্সপীয়রের নাটকে পাওয়া যায় বোধ হয় তদপেক্ষা গভীরতর ও বিস্তৃততর চিত্র পাওয়া যায় বেন্ জনসনের নাটকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা সংগত হইবে না যে বেন্ জনসনের নাটক শেক্সপীয়রের নাটক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গ্রীসের অর্থনৈতিক অবস্থা নাট্যকারদের অলক্ষিতে ইস্কিলাস প্রভৃতির নাটকে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, তখনকার ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যে গ্রীক নাটকের উদ্ভব হইয়াছে তাহাও সুবিদিত। কিন্তু এই নাটকগুলিকে প্রাণ দিয়াছে নাট্যকারদের প্রতিভা, সমাজ-ব্যবস্থা বা কোনো আচার-অনুষ্ঠান নহে।

২

সাহিত্য রূপসৃষ্টি। তাই কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, রূপ ছাড়া সাহিত্যে আর যাহা কিছু আছে তাহা অনিবার্য হইলেও সাহিত্য-বিচারে অগ্রাহ্য। ইঁহাদের মত বস্তুবাদীদের মতের বিপরীত। ইঁহারা বলেন যে রসের একটা আধার থাকিবেই; সেই আধার বস্তুজগৎ, কিন্তু বস্তুপিণ্ডের ওজন করিয়া সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য বা ললিতকলার শিল্পমূল্য নির্ধারিত হইবে না। রসের জগতে লৌকিক জগতের সত্যা-সত্যের কোনো মূল্য নাই। তাজমহল নির্মাণ করিবার সময় ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কিরূপ ছিল, তখন দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল কি না, যে-সব মজুরেরা এই সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল তাহারা উপযুক্ত মজুরি পাইয়াছিল কি না—এই-সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব আছে,

কিন্তু তাজমহলের শিল্পমূল্যবিচারে তাহারা অবান্তর। শুধু যে অবান্তর তাই নয়, অপ্রযোজ্য, অর্থাৎ লৌকিক জীবনে সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার যে-সকল উপায় আছে শিল্পে তাহা খাটে না। শিল্প শুধু রূপের সৃষ্টি। রোজার ফ্রাই বলিয়াছেন যে, আমরা যখন সুন্দর পাত্রকে দেখি, তখন তাহার সৌন্দর্য অনুভব করিতে হইলে বাস্তবজীবনের সমস্ত চিন্তা ভাবনা, লাভালাভ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই উহার রেখার সৌন্দর্য, উহার গঠন-কৌশল, উহার বঙ্কিম ভঙ্গি আমাদের উপলব্ধিতে প্রতিভাত হইবে। এইখানেও সত্যাসত্য থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহা রূপ ও রেখার সত্যাসত্য, বাস্তব-জীবনের সত্যাসত্য হইতে ইহা বিভিন্ন।

একই শব্দের দ্বারা এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যকে আখ্যাত করা হয়, কিন্তু ইহারা নিঃসম্পর্কিত। সংগীতকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর্ট বলিয়া মনে করা হয় : সংগীতের শব্দের কোনো অর্থ নাই বলিয়া ওখানে ভাব ও রূপ একদেহে লীন হইয়া গিয়াছে। ইহাই সংগীতের সত্য। ছবির অবশ্য একটা নাম থাকে, সংগীতেরও বিষয় থাকে, কিন্তু তাহা শিল্পসৃষ্টির উপলক্ষ মাত্র ; স্রষ্টা ও শ্রোতাকে তাহা জানাইয়া দেয় যে এই ভাবেই শিল্পী রেখা বা সুরের জাল রচনা করিয়াছেন। কীটস্ যে বলিয়াছিলেন Truth is Beauty, Beauty Truth, তাহার অর্থও এই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা সত্য তাহা সুন্দর, যখন তাহার বিষয়বস্তুকে ভুলিয়া যাইয়া আমরা শুধু তাহার রূপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। সুন্দর তখনই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় যখন বিষয়বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা শুধু রূপের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। যদি এই রূপোপলব্ধির ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে সত্য-সুন্দরের অভিন্নতা নষ্ট হইয়া যায়। যে কবি সত্য-সুন্দরের অবিনাভাব প্রচার করিয়াছিলেন তিনিই বলিয়াছেন, '... it (poetry) is not so fine a thing as philosophy,—

For the same reason that an eagle is not so fine a thing as a truth..' তিনি কল্পনায় সুধাকণ্ঠ নাইটিঙ্গেলকে অমর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার স্বল্পকালস্থায়ী সংগীত শেষ হইয়া গেলে তিনিই বলিয়াছেন—

> **Adieu ! the fancy cannot cheat so well**
> **As she is famed to do, deceiving elf.**

কীটসের পরস্পরবিরোধী উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তিনি সত্য ও সুন্দরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই; মনে হয় তিনি দুইপ্রকারের সত্যের মধ্যে বৈষম্য দেখিয়াছিলেন— এক কল্পনা-সৃষ্ট রূপের সত্য অপর বাস্তবজীবনের তথা বিজ্ঞান-ইতিহাসাদির সত্য। ওয়াল্‌টার পেটার রূপের প্রাধান্যে বিশ্বাস করিতেন এবং এইজন্য তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন যে, অন্য সমস্ত শিল্পই সংগীতের পর্যায়ে পৌঁছিতে চেষ্টা করে, কারণ প্রত্যেক শিল্পই অর্থের বা প্রয়োজনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া রূপের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহে। কিন্তু তিনিই আবার ভালো (good) শিল্প ও উচ্চাঙ্গের (great) শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। যে শিল্প সৌন্দর্যশালী মূর্তি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে তাহা আটপৌরে ভালো শিল্প, কিন্তু যেখানে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আছে তাহা উচ্চাঙ্গের শিল্প। এমনি করিয়া তিনি শিল্পে ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে শিরোধার্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাহিত্য ও শিল্পের রূপ বিষয়নিরপেক্ষ নহে; তাহা স্বয়ম্ভূও নহে, স্বয়ংসম্পূর্ণও নহে। বিষয়বস্তুকে মানিতে হইলে শিল্পে রূপবাদকে রক্ষা করা যায় না বলিয়া ক্লাইভ বেল বলিয়াছেন যে সাহিত্য খাঁটি শিল্প নহে। সাহিত্য রঙ ও পাথর লইয়া কারবার করে না, অর্থসমন্বিত শব্দের মাধ্যমে সাহিত্যিকের ভাব প্রকাশিত হয়। সেই অর্থ বাস্তবজীবনের সত্যাসত্যবর্জিত হইতে

পারে না। সুতরাং তাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

সাহিত্যের কথা বাদ দিয়া শুধু যদি শিল্পের দিকেই নজর দিই তাহা হইলেও ক্লাইভ বেলের যুক্তি খণ্ডন করা যাইবে। শিল্পে ভাব ও রূপ দুইই থাকে এবং ইহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে কোনো কোনো শিল্পে ভাব অপেক্ষা রূপের প্রাধান্য থাকে। ইহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ তাজমহল। নীচের অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরখানা ছাড়া এই সৌধে এমন কিছুই নাই যাহা করুণরসের ব্যঞ্জনা দিতে পারে। এখানকার আবেদন শুধু রূপের আবেদন, ভাবের আবেদন নহে। ইহার পরের স্তরের শিল্প—নৃত্য ও সংগীত। নৃত্যশিল্প বা সংগীতে অর্থসমন্বিত শব্দ না থাকিলেও ইহারা মানুষের ভাব ও ভাবনার সঙ্গে অসম্পৃক্ত নহে এবং মনুষ্যহৃদয়ের রতি, হাস, শোক, উৎসাহ প্রভৃতি উদ্দীপনার উপরে ইহাদের রূপও নির্ভরশীল। ডন-জুয়ান সম্পর্কিত কিংবদন্তী লইয়া মলিয়ের ও বার্নার্ড শ নাটক লিখিয়াছেন, বায়রন ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই যে যেমন বুঝিয়াছেন লম্পটের চরিত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোৎসার্ট এই আখ্যায়িকা লইয়া গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন। তিনিও এই অসংযত চরিত্রের সম্পর্কে যাহা কিছু সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সংগীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা যদি বিশুদ্ধ স্বরের সমষ্টি বা অর্থহীন ভাবে ভরা ভাষা হইত তাহা হইলে এই গীতিনাট্যের বিশিষ্ট রূপটিও থাকিত না। ক্লাইভ বেল দুই শ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্রকরের কথা বলিয়াছেন, 'একজন রাজনৈতিক অবস্থা বা ভাবনার সঙ্গে খাপ খায় এমন রেখা টানিতে পারেন এবং ছবিটি আঁকিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত বাক্চাতুর্যময় নামকরণ করিয়া ছবিটিকে সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষমতা

পরমাশ্চর্যময়, কিন্তু ইহা শিল্পীর শক্তি নয়। ঐ রাজনৈতিক অবস্থা বা ভাবনার সঙ্গে না মিলাইলে এই-সকল চিত্রের সার্থকতা থাকে না; ইহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহার কলাকৌশল বিস্ময়ের উৎপাদন করে, কিন্তু ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে আর একজন চিত্রকরের। ইনি প্রকৃত শিল্পী। তিনি শুধু রেখা টানিয়া যাইতেন, তাঁহার রেখা-চিত্রগুলি কোনো ভাব বা ঘটনার দৃষ্টান্ত বা বিবরণমাত্র নহে; তাহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ; শিল্পী তাহাদের সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনো কাহিনী রচনা করেন নাই বা ভাবেনও নাই। এই কাজের ভার তিনি দিতেন তাঁহার সহকারীর উপর।' কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে সহকারী চিত্রগুলির নামকরণ না করা পর্যন্ত এই দ্বিতীয় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় নাই, শিল্পীর প্রতিভাকে যে বিষয় স্পন্দিত করিয়া থাকিবে, সহকারী তাহাই যোজনা করিয়া শিল্পকর্মকে সমাপ্ত করিয়া দিতেন। যদি তাহাই না হইবে তাহা হইলে এই চিত্রগুলিকে ব্যঙ্গচিত্র বলার কোনো সার্থকতা থাকে না। ব্যঙ্গ তো ভাবেরই অভিব্যক্তি। যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক, রূপের সৌন্দর্যকে বিষয়ের সত্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না।

৩

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য ও শিল্প সত্যাসত্যনিরপেক্ষ নহে, তবে এখানকার সত্য অনুভবের সত্য, ব্যবহারিক জীবনের— শাস্ত্র-ইতিহাসাদির —সত্য নহে। মানুষের ভাষা অর্থ দিয়া সীমাবদ্ধ, পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে। কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের ভাষাও মহৎ সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে, কবি ছন্দে গানে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিতে পারেন:

> কহিলা বাল্মীকি, 'তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,
> সকল ঘটনা তাঁর— ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?

পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'
নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ এই অনুভবের সত্যকে প্রকাশ করিতে যাইয়া রোজার ফ্রাই, ক্লাইভ বেল প্রভৃতি শিল্পসমালোচকদের মত এবং তাঁহার মতের পার্থক্য স্পষ্ট করিয়াছেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত-ভাবে সেইটাকে কল্পনায় উপভোগ করা এই কবিতার লক্ষ্য নয়। বস্তুতঃ মন্দির হইতে বালিকার প্রত্যাবর্তন এই কবিতার বিষয় নহে। এই প্রত্যাবর্তনকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির মনে যে অনুভব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাই ছন্দোবন্ধে, বাক্যবিন্যাসে, উপমাসংযোগে একটি অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করিয়াছে। এই সত্য তথ্যগত সত্য হইতে পৃথক। ছেলে-ভুলানো ছড়ায় আছে :

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

'জুতুয়া' শব্দটি জুতা-সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করে না, মায়ের অনুভূতির সত্যকে প্রকাশ করে। এই অনুভূতির মধ্য দিয়া মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সত্য ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় আবার শ্রেণীগত রূপের অস্পষ্ট ব্যাপকতাও ইহার নাই।

রবীন্দ্রনাথ কবি; তিনি তাঁহার বক্তব্য বহু উপমার সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। উপমা বাদ দিলে তাঁহার যুক্তি এইভাবে

উপস্থাপিত করা যাইতে পারে : ব্যবহারিক জীবনের বা বিজ্ঞানের সত্য ও সাহিত্যের সত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে ; যদিও ব্যবহারিক জীবনের ব্যাপার ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ব্যাপার এক জাতীয় বস্তু নহে, তবু মোটামুটিভাবে ইহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে— তথ্য। সাহিত্যের সত্য অনুভূতির রসে রঞ্জিত— বস্তু হইতে সেই মায়া তো সত্যতর। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন অধিকাংশ আলংকারিক মনে করেন যে, সাহিত্যে বাস্তবজীবনের সত্যাসত্যের প্রশ্ন অপ্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য শুধু অনুভূতির প্রকাশ এবং অনুভূতির সাহায্যে ইহা বাস্তব জীবনের সত্য অপেক্ষা গভীরতর সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

সত্যের সংজ্ঞা লইয়া বিরোধের অন্ত নাই। সেই তর্ককণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সত্য সেই বস্তু যাহার অস্তিত্ব বক্তার ব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ। আকাশকুসুম আকাশে থাকে না ; তাহা ব্যক্তিবিশেষের বিভ্রম মাত্র। আকাশকুসুমকে তখনি সত্য বলিয়া মনে করা যায় যখন ইহাকে সেই ব্যক্তিবিশেষের মানসিক বিকার হিসাবে দেখা যায়। এই জাতীয় সত্য ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ ; ইহা বস্তুজগৎকে বিকৃত করিয়া দেখে এবং ইহার মধ্যে বিশ্বজনীনতা নাই। অনুভবের সত্য এই শ্রেণীর সত্য। খোকা পুতুল লইয়া খেলা করে ; সে নিজের পুতুলকে অনুভবের রসে রঞ্জিত করে। পুতুলের মধ্যে সে যে সৌন্দর্য আরোপ করে তাহা শুধু তাহার উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ। পুতুলের সেই সৌন্দর্য নাই। আমরা খোকাকে সহানুভূতি জানাইতে পারি, কিন্তু সহানুভূতি অনুভূতি অপেক্ষা ফিকে এবং যে সত্য অনুভূতিতে নাই তাহা সহানুভূতিতে থাকিতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনে, শাস্ত্রে, বিজ্ঞানে আমরা বস্তুর অখণ্ড রূপ পাই না। ইহা মানিয়া লইলেও অনুভবের সাহায্যে সত্যের অখণ্ড মূর্তিকে ধরা যায় এইরূপ মনে করার কোনো কারণ নাই।

কবির প্রতিভা যে সত্য রচনা করে তাহা বস্তুজগতের সত্যও নহে, নিছক অনুভবের সত্যও নহে। অনুভবে ইহার উদ্ভব, কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিস্তৃতি আছে তাহা ব্যক্তিগত অনুভবে নাই। অনুভব তখনি সাহিত্যে রূপান্তরিত হয় যখন তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্বজনীন রূপ পায়। ওফেলিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বুঝাইতে যাইয়া হ্যামলেট বলিয়াছিল :

> I lov'd Ophelia : ıorty thousand brothers
> Could not, with all their quantity of love,
> Make up my sum.

ভালোবাসা গণনার বস্তু নয় এবং চল্লিশ হাজার ভাইয়ের ভালোবাসা একত্র করা যায় না। হ্যামলেটের মা এই-সব উক্তির মধ্যে উন্মাদগ্রস্ততার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু হ্যামলেটের চরিত্রে এই উক্তি সুসমঞ্জস এবং হ্যামলেটের চরিত্র বা কাহিনী শুধু কোনো লোকের অনুভবের প্রকাশ নহে, তাহার অনুভব-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কতকগুলি ফুল দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'Ten thousand saw I at a glance'। চোখের এক পলকে কেহ দশ হাজার ফুল দেখিতে পারে না, কবি কয়টা ফুল দেখিয়াছেন তাহা গণিয়া দেখেন নাই। তিনি যে দশ হাজার ফুল দেখিয়াছেন ইহা তাঁহার অনুভব মাত্র, কিন্তু যদি ইহা ব্যক্তিগত অনুভব মাত্র হইত তাহা হইলে ইহা একটা বিভ্রমের পর্যায়ে পড়িত। রসবেত্তা পাঠক এই অনুভবের অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া ইহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নারদ বাল্মীকিকে বলিয়াছেন যে কবির মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য, কিন্তু সেই মনোভূমিতে যাহা রচিত হইবে তাহা শুধু ব্যক্তিগত অনুভব নহে, তাহা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শের রূপায়ণ, মহামানবের স্তবগান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সাহিত্যের সত্য এবং ব্যবহারিক জীবনের বা শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সত্য— ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নাই অর্থাৎ ইহাদের উভয়েরই ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। ইহারা নিঃসম্পর্কিতও নয়। অতুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যের অন্যফল-নিরপেক্ষত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন, 'বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপরে রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে।' মানুষ চরম সত্যের সন্ধান পায় নাই ; যেদিন তাহা পাইবে সেই দিন তাহার আলো-ছায়ায় ঘেরা মনুষ্যজন্ম শেষ হইবে এবং সে সত্যের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত নূতন জগতে উন্নীত হইবে। যতদিন অর্ধ-আলোকিত মর্তলোকে আছি ততদিন জোর করিয়া বলিতে পারি না সত্যলাভের কোন্ পথ সত্যতর। কেহ সাহিত্যকে মিথ্যার বেসাতি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কেহ ইহাকে সত্যাসত্যনিরপেক্ষ অভিনব সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের মত সর্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ডক্টর ব্র্যাড্‌লি : **'...the pursuit of poetry for its own sake is the pursuit both of truth and of goodness....wherever the imagination is satisfied, there, if we had a knowledge we have not, we should discover no idle fancy but the image of a truth.'**

যদিও সবরকমের সত্যের মধ্যে মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে, তবু ইহাদের মধ্যে উপলব্ধিগত পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে ও বিজ্ঞানে আমরা যে সত্যের সন্ধান পাই তাহা গণিতের নিয়মের সঙ্গে অথবা বস্তুজগতের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইতে হয়। ইহার মধ্যে কল্পনা ও অনুভবের স্থান নাই বলিলেই হয়।[১] কিন্তু ইতিহাস দর্শন ও

[১] কোনো কোনো দার্শনিক অবশ্য বিজ্ঞানের সত্যকে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন।

ধর্মশাস্ত্রে পদার্থবিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে। সেইখানে কল্পনা ও অনুভবের প্রবেশ আছে। কবিপ্রতিভা বুদ্ধিবিবর্জিত নহে, কিন্তু এইখানে বুদ্ধি কল্পনা ও অনুভূতিতে সমৃদ্ধ। বাস্তবজীবনে আমরা যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান লাভ করি, কবির জ্ঞানের মধ্যেও সেই প্রত্যক্ষতা আছে; তবে সেই প্রত্যক্ষতা অন্তর-লোকের প্রত্যক্ষতা। বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত কৌতূহলের সহিত বস্তুর পরীক্ষা করেন এবং বিশ্বজনীন প্রমাণসাপেক্ষ নিয়মের সন্ধান করেন। নিউটন-কর্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সুস্পষ্ট হইবে। ইহা ব্যক্তিগত পক্ষপাতের সঙ্গে অ-সম্পৃক্ত, পৃথিবীর সকল বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং যে-কোনো সময় যে-কোনো জিনিস দিয়া ইহাকে প্রমাণ করা যায়। সাহিত্যিক কৌতূহলী, কিন্তু পক্ষপাত-বিবর্জিত নহেন। তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে ব্যক্তিগত পক্ষপাতে যাহার জন্ম তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্বজনীন রূপলাভ করে। মাধ্যা-কর্ষণতত্ত্বের ন্যায় ইহা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে অনেক উদ্ভট ও অসম্ভাব্য বস্তু পাওয়া যাইবে, কিন্তু ইহার সমগ্র রূপটি উপলব্ধিতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং বুদ্ধি তাহাকে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে যদি বুদ্ধির স্থান না থাকিত তাহা হইলে তাহা কবিসহৃদয়ের মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না, উদগ্র অবিশ্বাসকে নিরস্ত করিতে পারিত না। তাহা হইলে শিল্পসাহিত্যের আবেদন মনের বাহিরের কোঠায় পড়িয়া থাকিত, তাহাকে আমরা হৃদা মনীষা মনসা গ্রহণ করিতে পারিতাম না।

বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা মনে করি যে সত্যের একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্বাস রহিয়াছে গণিতের সূত্রে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে। কিন্তু সত্যের এই প্রমাণ অমোঘও নহে এবং সর্বত্র প্রযোজ্যও নহে। বিজ্ঞান আজ

যাহাকে অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছে কাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। তার পর প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রমাণই বস্তুর কোনো একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহার সমগ্র রূপটি ধরিতে চেষ্টা করে না। সেই হিসাবে বিজ্ঞানের সত্য শুধু যে সন্দেহসঙ্কুল তাহাই নহে, একদেশদর্শীও! বাস্তবজীবনেও আমরা সব সময় এই জাতীয় প্রমাণের দ্বারা চালিত হই না। আমার বহু বন্ধুর মধ্যে কাহাকে কতটুকু বিশ্বাস করিব, কোন্ মানুষ কতটা শ্রদ্ধেয়— ইহার বিচারে বুদ্ধির স্থান আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো নিয়ামক আমার অন্তরতম উপলব্ধি যাহা বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য না করিলেও অতিক্রম করে। এই উপলব্ধি সব সময় অভ্রান্ত এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু ইহা গাণিতিক প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা ব্যাপক এবং হয়তো অধিক নির্ভরযোগ্য। এই উপলব্ধিই কবিপ্রতিভার দ্বারা উদ্ভাসিত হইলে অ-লৌকিক রসজগৎ রচনা করে যেখানে ব্র্যাড্‌লির ভাষায় আমরা বলিতে পারি, '...**if we had a knowledge we have not, we should discover no idle fancy but the image of a truth.**'

কবির উদ্ভাবনী শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে; অলীক কল্পনা (**fancy**) যাহা আকাশকুসুম রচনা করে এবং সত্যাসত্যের ধার ধারে না আর কবিপ্রতিভা (**imagination**) যাহা শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে না পরন্তু সৌন্দর্যের উপর সত্যের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দেয়। এই সৃষ্টির মধ্যে অনেক কিছু অবিশ্বাস্য অসম্ভাব্য থাকে, কিন্তু আপাত-অসম্ভবের মাধ্যমেই ইহা সত্যের নিভৃততম কন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। বার্নার্ড শ তাঁহার একটি নাটক সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ইহা— **true history that never happened**। ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের গোড়ার কথা। ইহাদের

আবেদন নিছক বুদ্ধির কাছে নহে, নিছক অনুভবের কাছেও নহে, বুদ্ধি ও অনুভবের দ্বারা উদ্ভাসিত উপলব্ধি ও অপূর্বনির্মাণক্ষমা কল্পনার কাছে। এইজন্যই বাল্মীকির রচিত কাহিনী অযোধ্যার চেয়ে সত্যতর।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

সাহিত্য ও নীতি

'... the bad fable *has* a moral and the good fable *is* a moral.'

সাহিত্যের সঙ্গে নীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না এই প্রশ্ন লইয়া বহু বাদবিতণ্ডা হইয়াছে। প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে দুই রকমের মতের পরিচয় পাওয়া যায়। আলংকারিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কাব্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, আনন্দ-রসনিঃস্যন্দী রূপককে যাঁহারা ইতিহাস প্রভৃতির মতো (সাংসারিক জ্ঞানের) ব্যুৎপত্তিমাত্র মনে করেন সেই-সব আস্বাদপরাঙ্মুখ লোকদিগকে নমস্কার। পাশ্চাত্য আলংকারিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে সাহিত্য অন্যফলনিরপেক্ষ, রূপসৃষ্টি ছাড়া তাহার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সাহিত্য শুধু রূপের সৃষ্টি নহে, তাহা মানুষের চিন্তা ভাবনা ও অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই প্রভাবের গুণাগুণের দ্বারাই তাহার মূল্য নির্ধারিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য মানুষের মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তাহাকে ভাবপ্রবণ ও দুর্বল করিয়া তোলে। অন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, কাব্য সাহিত্য প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া চিত্তের প্রশান্তি সম্পাদন করে। যে সাহিত্য শুধু প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া চিত্তবিভ্রমের সৃষ্টি করে, যাহা উচ্চ আদর্শের বাহন নহে, তাহা সাহিত্য হিসাবেও নিকৃষ্ট। সাহিত্য আস্বাদস্বরূপ কিন্তু তাহা আস্বাদেই পর্যবসিত নহে। সাহিত্য কিসের আস্বাদ দেয় তাহাও প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে অর্থাৎ সাহিত্যের মূল্য অনেকখানি— কাহারো কাহারো মতে প্রধানত— নির্ভর করে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর উপরে।

২

প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে যে সাহিত্যিক প্রজাপতির মতো চরিত্র সৃষ্টি করেন। সেই চরিত্রগুলি তাঁহার স্বকীয় অনুভূতিতে রঞ্জিত। সুতরাং তাহারা তাঁহারই ভাব ও ভাবনার রূপক। অথচ নিজের ভাব ও ভাবনা বিশ্বব্যাপক হইলেই তাহা রসের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং সাহিত্যের প্রধান গুণ তীব্র অনুভূতি ও বিস্তৃত সহানুভূতি। এই অর্থেই শিল্প ও কাব্য দ্রুতিবিস্তারবিকাশাত্মক। ইহাতে চিত্ত বিগলিত হয় আবার তাহা ব্যক্তিগত ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া অসীম ও চিরন্তনের দিকে ধাবিত হয়।

নীতির দিক দিয়া সাহিত্যের ইহাই প্রথম ও প্রধান সার্থকতা; ইহা কবি ও সহৃদয়কে নানা অবস্থা, নানা ভাব, নানা চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে সাহায্য করে অথচ সেই সেই অবস্থা ও ভাব অ-লৌকিক জগতে উন্নীত হয় বলিয়া চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয় না, মনের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠে না। প্লেটো অভিযোগ করিয়াছিলেন যে হোমার যোদ্ধাদের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নাই এবং তাঁহার কাব্য পড়িয়া কোনো লোক যুদ্ধ-কৌশল শিখিতে পারিবে না। এই অভিযোগ অতীব সত্য, কিন্তু ইহার সঙ্গে কাব্যের উপকারিতার কোনো সংস্রব নাই। যুদ্ধবিদ্যার প্রতি অনুরাগ বা ঔদাসীন্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানবজীবনের যে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই কাব্যের বিষয়বস্তু এবং সেই রহস্যের উপলব্ধিই কাব্যের শিক্ষণীয় বস্তু। হোমার বা অন্যান্য কবিদের রচনায় নানাপ্রকার যোদ্ধার চিত্র পাওয়া যায়— কেহ সাহসী, কেহ ভীরু, কেহ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কেহ আদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান, কেহ যুদ্ধের বিভীষিকায় হতভম্ব, কেহ তাহার মধ্যে মহৎ আত্মোৎসর্গের যে সম্ভাবনা

আছে তদ্দ্বারা উদ্‌বোধিত। এই বিচিত্র ভাব ও ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি বলিয়া সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চিত্ত প্রসারিত হয়, আমাদের অনুভূতি তীক্ষ্ণতা লাভ করে। আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি যে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অকেজো; তাঁহারা ভাববিলাসী। কথাটা হয়তো আংশিক ভাবে সত্য। হোমার যে একিলিসের মতো যুদ্ধ করিতে পারিতেন না ইহা মানিয়া লইতে লজ্জা নাই। মানুষ যে কাজ করে তাহা প্রত্যক্ষ, তাহার ফলও হাতে-হাতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরের ঘটনা মানবজীবনের অংশ মাত্র এবং তাহাও তখনি সম্পূর্ণ মূল্য পায় যখন আমরা তাহাকে অন্তরলোকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখি এবং শিল্প ও সাহিত্য এই অন্তরলোককেই উদ্ভাসিত করে। অ্যারিস্টটল বলিয়াছিলেন যে ট্র্যাজেডি চিত্তকে পরিশোধিত করে। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের আসল ফল— চিত্তের পরিশোধন নহে— চিত্তের সম্প্রসারণ এবং অনুভূতির গভীরতা-সম্পাদন।

৩

সাহিত্যের দ্বিতীয় ফল এই যে ইহা সাহিত্যিকের জীবনবেদ প্রকাশ করে। সাহিত্য শুধু যে অনুভবের অভিব্যক্তি নহে, তাহার সঙ্গে যে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার সংযোগ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ কোনো-একটি বিশেষ মত প্রকাশ করিবার জন্য সাহিত্য রচনা করেন এবং এই জাতীয় সাহিত্যকে বলা হয় প্রচারধর্মী সাহিত্য। যাঁহারা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাসী তাঁহারা প্রচারধর্মী সাহিত্যকে অপাংক্তেয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া তাঁহারা যে সাহিত্যকে শিরোধার্য করেন তাহাও প্রচারধর্মী। শুধু তাহা কোনো মৌলিক, বিদ্রোহাত্মক নীতি প্রচার না করিয়া প্রচলিত চিরাচরিত রীতিনীতির জয়গান করে। কেহ কেহ

বলেন, মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সর্বসাধারণ-গ্রাহ্য নীতি ও দর্শন রচনা করে এবং কল্পনার দ্বারা একক প্রত্যক্ষ ছবি রচনা করে। এই একক ও প্রত্যক্ষ ছবি রচনা করেন কবি এবং সেই একক ছবিগুলি একত্র করিয়া তাহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহির করেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। প্রথমে ছবি আঁকে কবির প্রতিভা; তার পর সংজ্ঞা ও সূত্র যোজনা করে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি। আদম যেদিন বিস্ময়াবিষ্ট চোখে প্রথম পৃথিবীর দিকে চাহিয়াছিল তখন সে শ্রেণী-বিভাগ করিতে শিখে নাই, ভালো-মন্দ বিচার করিতে শিখে নাই, কোনো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার বা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। তাহার সেই প্রথম দৃষ্টি শুধু রূপের দৃষ্টি, রসের দৃষ্টি। আদম নামক অথবা মানুষের সেই জাতীয় অন্য কোনো প্রপিতামহ কুত্রাপি ছিল না। এই মিথ্যা উপমার ভিত্তিতে কোনো সত্য যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের বুদ্ধি ও তাহার অনুভূতি এবং কল্পনা এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে সে তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া শুধু কোনো একটির দ্বারা চালিত হইতে পারে না। গণিত ও বিজ্ঞান অনেকটা অনুভূতিনিরপেক্ষ বটে: ইহারা শুধু বুদ্ধির দ্বারা, পরীক্ষার দ্বারা অগ্রসর হইতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিত প্রাণহীন আর সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ প্রাণচাঞ্চল্য। প্রাণশক্তির প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা নানা বৃত্তির মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। শুধু যে আমরা বুদ্ধি ও কল্পনাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না তাহা নহে, কোনো কবি সেই চেষ্টা করেনও নাই। সবাই কোনো একটি মতবাদের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। কীটস্ বলিয়াছেন যে, যে কবিতা কোনো উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয় সেই কবিতার প্রতি তাঁহার একটা বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু সুন্দরের জয়গান করিবার এবং সত্যসুন্দরের অবিনাভাব প্রচার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি নিজে কবিতা লিখিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যাঁহারা প্রচারধর্মী সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া মানেন না বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা প্রচলিত আদর্শের প্রচারকেই বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া মনে করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক লইয়া যে-সকল বাদবিতণ্ডা হইয়াছে তাহার মূলে কতকগুলি অযৌক্তিক ধারণা আছে। তাহাদের নিরসন করা প্রয়োজন। সাহিত্যের ফল নীতিশিক্ষা; কিন্তু অপরের মনে কী ভাব উদ্রিক্ত হইল তদ্দ্বারা তাহার বিচার করার প্রয়োজন নাই। অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, 'কাব্য মানুষের যে সভ্যতা-বৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে।··· কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যয় না ঘটলে মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টি সাধন করে, যা মুকুলেই ঝরে যায়।' সাহিত্য মানবজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু সেই প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড নহে, কারণ সেই প্রভাবের মধ্যে অনেক আকস্মিক বস্তু মিশ্রিত আছে। শোনা যায় ডন কুইক্সোট সামন্ততন্ত্রের উপর আঘাত হানিয়াছিল এবং 'টমকাকার কুটীর' দাসব্যাবসা রহিত করার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এই প্রভাবের দ্বারা ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারিত হইবে না।

এই সম্পর্কে আর-একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপযোজনাকে— তাহার content ও formকে— বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইতে পারে। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি গল্প হিসাবে উপভোগ করা যাইতে পারে এবং সেই উপভোগের পরে নীতি বা উপদেশ আহরণ করা যাইতে পারে। যে-কোনো নীতিগর্ভ কাহিনী সম্পর্কেই এই কথা বলা যাইতে পারে। বার্নার্ড শ বলিয়াছেন যে নাটকের বিষয়বস্তু, তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাবনা, যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু

তাহার রূপ অবিনশ্বর। যে-সমস্ত অনুভব ও চিন্তা শেক্সপীয়রের নাটকে রূপ পাইয়াছে তাহা আজ বাসি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই নাটকের গঠনকৌশলের মাধুর্য বা শেক্সপীয়রের সংগীতময় পদলালিত্য ম্লান হইয়া যায় নাই। ইতালিয় দার্শনিক ক্রোচে বলিয়াছেন যে কোনো কাব্যে বা নাটকে যদি কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তা কোনো মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা হইলে সেই উক্তিকে বক্তার চরিত্রের জ্ঞাপক হিসাবে দেখিতে হইবে। মতবাদ হিসাবে তাহার যদি কোনো মূল্য থাকে সাহিত্যের সঙ্গে সেই মূল্যের কোনো সম্পর্ক নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ক্রোচের যুক্তিটা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকে আছে :

> **Good name in man and woman, dear my lord,**
> **Is the immediate jewel of their soul :**
> **Who steals my purse steals trash ; 'tis something, nothing ;**
> **'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands ;**
> **But he that filches from me my good name**
> **Robs me of that which not enriches him,**
> **And makes me poor indeed.**

ইহা অতি সারবান উপদেশ, কিন্তু এই সারবত্তার সঙ্গে এই বক্তৃতার সাহিত্যিক মূল্যের কোনো সম্পর্ক নাই। এই নীতিগর্ভ বক্তৃতার বক্তা ইয়াগো যাহাকে শেক্সপীয়র শয়তানের প্রতিমূর্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যে অবস্থায় ইয়াগো এই মন্তব্য করিয়াছিল সেই অবস্থায় তাহার চরিত্রের যে দিকটি এখানে প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাই ইহাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিয়াছে। যদি নীতিপ্রচারই শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি ইয়াগোর মতো পাপাত্মাকে বক্তা করিতেন না।

ক্রোচে শিল্প ও সাহিত্যের অন্যফলনিরপেক্ষত্বে বিশ্বাসী আর বার্নার্ড শ'র মতে সমস্ত শিল্পপ্রচেষ্টাই প্রচারধর্মী। কিন্তু ইহারা উভয়েই

শিল্প ও সাহিত্যের নীতিগর্ভতা ও রূপযোজনাকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে শিল্পসাহিত্যের এই দুইটি দিক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কবিপ্রতিভার প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে, তাহা জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রতিভা না থাকিলে শুধু জ্ঞানের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা কেহ কবি বা শিল্পী হইতে পারে না। কিন্তু কবি ভাবের সঙ্গে রূপের যোজনা করেন না, ভাব তাঁহার কাব্যের রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন্ সাহিত্যিক মহাকাব্য লিখিবেন, কে নাটক লিখিবেন আর কেই বা উপন্যাস লিখিবেন— তাহা নির্ভর করিবে তাঁহাদের সৃজনী-প্রতিভার উপরে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে চিন্তা করিবেন, যে ভাবে জীবনকে দেখিবেন তাহার উপরে তাঁহাদের কাব্যের রূপের রূপ নির্ভর করিবে। একটা নিতান্ত গন্তময় উপমার সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। গণিতে এই জাতীয় অঙ্ক দেখা যায়: ক (খ, গ, ঘ, ঙ)। বন্ধনীর ভিতরে যে অঙ্কটা আছে তাহার একটা মূল্য আছে। কিন্তু বন্ধনীর বাহিরে 'ক'-এর মূল্যের উপর সমগ্র অঙ্কটির মূল্য নির্ভর করিবে। শুধু তাই নয়; 'ক'-এর চরম মূল্যও নির্ভর করিবে বন্ধনীর ভিতরকার অঙ্কটির মূল্যের উপর। এইভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, কবিপ্রতিভা যে রূপের সৃষ্টি করে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় কবির জীবনবেদের দ্বারা আর তাঁহার জীবনবেদ তখনই রসজগতে স্থান পায় যখন তাহা সজীব রূপ পরিগ্রহ করে।

ভাব কেমন করিয়া রূপসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাহা বুঝা যাইবে। সূর্যমুখী ও রোহিণী স্ব-স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কক্ষ যে রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর কক্ষ হইতে পৃথক সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। এই পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের জীবনবেদ। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণতায় ও ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁহার অনুভব নিসর্গচিত্র উপমা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। শেক্সপীয়রের জীবনবেদ কী ছিল, তাঁহার আদৌ কোনো জীবনবেদ ছিল

কি না আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা মানিতে হইবে যে, তিনি যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি রচনা করিয়াছিলেন তখন তিনি জগতে অকল্যাণময় ও কল্যাণময় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন; ইহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁহার ট্র্যাজেডির উপজীব্য। বার্নার্ড শ ভালো ও মন্দ এই দুই শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহার মতে, '...the really good man is as rare as the really bad man'। সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই যে তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়াছে, কমেডি-রচনায়। নরনারীর যৌন আকর্ষণের দুর্বারতাকে বার্নার্ড শ স্বীকার করিতেন, কিন্তু ইহাকে তিনি ক্ষণিক উদ্বেলতা বলিয়াও মনে করিতেন। তাই তিনি প্রেমের অমরাবতী রচনা করেন নাই। শেক্সপীয়রের মনের কথা ঠিকমত না জানিলেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনো এক সময়ে তিনি একনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমকে জীবনের চরম গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। তাই দাম্পত্য প্রেম লইয়া বার্নার্ড শ ক্যানডিডা প্রভৃতি কমেডি লিখিয়াছেন, আর প্রেমের একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী শেক্সপীয়র ওথেলোর মতো ট্র্যাজেডি রচনা করিলেন। প্রণয় ও ঈর্ষা লইয়া শেক্সপীয়রও কমেডি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই-সব কমেডির আঙ্গিক ক্যানডিডা প্রভৃতির মতো নয়। কোনো অবস্থায়ই নিছক রূপসৃষ্টিকে স্রষ্টার আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। এই-সকল আদর্শের দ্বারা বাস্তবজীবনে কাহার কী উপকার হয় সেই প্রশ্ন গৌণ। কিন্তু ইহারা যে ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার ফলে আমরা জীবনের গভীরতর তীব্রতর পরিচয় পাই। এই লাভই যথেষ্ট।

আপত্তি হইতে পারে, যুগে যুগে মানুষের ধর্মমত, বৈজ্ঞানিক মত, ঐতিহাসিক মতের পরিবর্তন হয়। আজ যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে কাল তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। এক দেশে যাহা বেদবাক্য অপর দেশে তাহা পরিহাসের বস্তু। সাহিত্য যদি জীবনবেদের

দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয় তাহা হইলে কি যুগে যুগে মতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যেরও পরিবর্তন হইবে না? দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী লইয়া ঘর করিয়া সতী নাম পাইয়াছিলেন, আজ এই সতীত্বের কল্পনা করাও বীভৎস বলিয়া মনে হয়। সেণ্ট টমাস্ অ্যাকুইনাসের জীবনবেদ দান্তের কাব্যের ভিত্তিভূমি; কিন্তু ঐ জীবনবেদে যাহারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে দান্তের কাব্যের সৌন্দর্য ম্লান হইয়া গিয়াছে এমন কথা কেহ বলিবে না; দ্রৌপদীর বহুভর্তৃকতা সত্ত্বেও আধুনিককালে মহাভারতের সাহিত্যিক মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমে নাই। ইহার কারণ সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকে না, জীবনের রহস্য ও জটিলতার পরিচয় দেয়। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মত সত্য হউক, মিথ্যা হউক, স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক— সাহিত্যে তাহার প্রয়োজন হয় জীবনের পরিচয় দেওয়ার জন্য; পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে ঘোরে, না, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সেই বিষয়ে সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠক উদাসীন থাকিতে পারেন যদি তাঁহারা জীবনের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিতে পারেন। হয়তো যদি সাহিত্যে কথিত মতবাদকে সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সাহিত্যের আবেদন নিবিড়তর হইবে। যিনি ডিমক্রিটাস ও এপিকুরাসের দর্শন মানিতে পারেন তিনি লুক্রেসিয়ুসের কবিতার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু মতবাদের যাথার্থ্যকে স্বীকার না করিলে সাহিত্যের রস উপলব্ধি করা যাইবে না এইরূপ মনে করা ভুল। সাহিত্য মতের প্রচার করে, কিন্তু তদপেক্ষাও বেশি, মনের প্রকাশ করে।

—

পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থে সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার। বলা হইয়াছে যে, সাহিত্য ভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। এই মন্তব্য শুধু উপচরিত অর্থেই— metaphor বা analogy বলেই— মান্য। সাহিত্য যদি সোজাসুজি অভিব্যক্তিই হইত, তাহা হইলে ক্রৌঞ্চের শোক ও বাল্মীকির শোক, বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তি ও কাব্যের অভিব্যক্তি সমশ্রেণীর হইত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আমাদের চৈতন্য ব্যবহারিক জীবনে নানা অবান্তর বস্তুতে আচ্ছন্ন থাকে, নানা বিঘ্নের জন্য আমরা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। সাহিত্য সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া, সেই বিঘ্ন অপসারণ করিয়া চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। সেইজন্যই ইহার অপর নাম ভগ্নাবরণা চিৎ এবং এইজন্যই সাহিত্যের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভরতের সূত্রে ভাবের উল্লেখ করা হয় নাই। যাহা প্রকাশ পায় তাহা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব এবং তাহাদের সাহায্যে ভাবের দর্শন হয়। ইহারই নাম রসাস্বাদ।